একজন মিসেস নন্দী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

অভিরতি 2
একজন মিসেস নন্দী 14
ঝড় 30
নাগরী 48
বীতশোক 68
মন পবনের নাও 83
মহাবিহার 94
মান 115
সম্পাদক 132

অভিরতি

গাঁয়ের নামে নাম বউটির।

পাহাড়ঘেঁষা রুক্ষ গ্রামটার নাম ভবানী। আর মহেশকরের ঘরের বউয়ের নাম ভবানীবাঈ।

তা বিয়ের আগে নামের মুখরক্ষা করেছিল বটে মেয়েটা। মারাঠী রাজপুত দলবী। ঘরের মেয়ে। পোষ মানাতে গেলে ফোঁস করে ওঠা স্বভাব। তার ওপর ছেলেবেলা থেকে মাথার ওপর কড়া অভিভাবক না থাকার ফলে অপরিণত বয়সের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা-বিঘ্ন তেমন পড়ে নি। ভাই ফৌজে চাকরি করে। বছরে দু-বছরে কখনো-সখনো। এসে দু-দশদিনের জন্য ঘুরে যায়। বাপ অন্ধ। বসন্ত হয়ে প্রথমে একটা চোখ গিয়েছিল, পরে দ্বিতীয়টারও দৃষ্টি গেছে। দারিদ্র্যের সংসার সামাল দিতে দিতেই মায়ের হিমসিম অবস্থা, মেয়েকে আগলাবে কখন?

ফলে সময়ে বিয়েও হয় নি মেয়েটার। ওদের ঘরে ছোট বয়সে বিয়ে হয়। তার ওপর চোখে পড়ার মতো চোখা রূপ নেই যে কেউ সেধে এসে ঘরে নিয়ে যাবে। মোটামুটি সুশ্রী হলেও দুরন্তপনা আর বেয়াড়াপনার ফলে চেহারায় একটা পুরুষালি কাঠিন্য দিনকে দিন বেশি প্রাধান্য লাভ করছিল। তার জ্বালায় অস্থির পড়শিনীদের অনেক সময় মন্তব্য করতে শোনা গেছে, ওটা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে অন্ধ বাপের কাজে লাগত, ও-মেয়ে নির্ঘাত হাত-পা ভেঙে বাপের বোঝা হবে একদিন।

পারলে এমন মেয়ের হাত-পা হয়ত ভেঙেই দিত কেউ। হাত-পা, অল্প-স্বল্প ভেঙে একটু শিক্ষা হোক এমন আশাও যে কেউ করে না এ-কথাও হলপ করে বলা যায় না। ভোর হতে না হতে ছেলেমেয়ের দঙ্গল নিয়ে ভবানী হুড়মুড় করে একেবারে ওই পাহাড়ের ডগায় গিয়ে উঠবে। পাহাড়টার আড়াল থেকে সূর্যোদয় হয় বলেই ওটার নাম সূর্য পাহাড়। সূর্যোদয় দেখে তারা আবার দৌড়ঝাঁপ করে নেমে আসে। এই ওঠা-নামার রেষারেষিতে ছেলেরাও পেরে ওঠে না তার সঙ্গে। আর ওই মেয়ে জখম হওয়ার বদলে একটু আধটু জখম অন্যের ছেলেমেয়েরাই হয়।

পাহাড়ের অনতিদূরে ছাতলি নদী। নামেই নদী, বারো মাস শুকনো নুড়িপাথরের হাড়-পাঁজর বার করেই আছে। ওই শুকনো নদীতেই হুটোপুটি করে সকলে, আর দৈবাৎ কখনো বেশি বর্ষা হলে বা বান ডাকলে আশেপাশের বাসিন্দারা প্রমাদ গোনে। ওই দস্যি মেয়েকে তখন রুখবে কে, সকাল-সন্ধ্যায় চারবার করে সেই খরজলে। ঝাপাঝাপি করবেই। করুক, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘরের ছেলেমেয়েদেরও যে ঠেকানো-যায় না। একবার তো একজনের মেয়ে ডুবতে ডুবতে বেঁচেছে, আর একবার একটা ছেলে পাথরে চোট খেয়ে পুরো একদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

এটা মৌজা গ্রাম, অর্থাৎ দোকান-পাট, হাট-বাজার নেই। ভবানী রোজ কসবায় যায় হাট-বাজার সওদাপত্র করতে। যেখানে ওসব আছে তার নাম কসবা। তা সেখানেও নিত্য ঝগড়া করে আসে। যে দামে যে জিনিস পাওয়ার অভিলাষ তা আদায় না করে নড়বে না। দোকানীকে কটু কথা বলবে, সুবিধে বুঝে ভয়ও দেখাবে।

সকলেই তিক্ত বিরক্ত তার ওপর।

এরপর আরো কিছু বয়েস হতে মেয়েটার দুরন্তপনা অতটা প্রত্যক্ষগোচর না হোক, তার বেয়াড়াপনার আঁচ সকলেরই গায়ে লাগে। মেয়ের বিয়ে নিয়ে ওর বাপ-মাকে দুকথা শোনাতে গেলে, এমন কি দুটো সৎ পরামর্শ দিতে গেলেও ওই মেয়ের রসনার ঘায়ে পালাবার পথ মেলে না! অথচ, এ ব্যাপারেও তাদের তৎপর না হয়ে উপায় কি? উঠতি বয়েসের ঘরের ছেলেগুলো যে ওর আশেপাশেই ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়!

শেষে ওদের একঘরে করারই মতলব কেঁদেছিল পাড়াপড়শীরা। এত বয়েস। পর্যন্ত অমন মেয়ে ঘরে পুষে রাখাটা অপরাধেরই সামিল। কত বুড়ো-হাবড়া। অন্ধ-খঞ্জ আছে, একজনের হাতে গছিয়ে দিলেই তো হয়।

বয়স্ক মাতব্বরেরা কথাটা তুলল গাঁয়ের পাটিল ও মোড়ল কেশরকরের কাছে। কেশরকর প্রায় বৃদ্ধ, কিন্তু বেশ সবল পুরুষ। মস্ত যোদ্ধাবংশের সন্তান, তাকেও বীরপুরুষ জ্ঞানে মান্যগণ্য করে সকলে। তাদের বীর-বংশের অনেক কথা আজও উপকথা হয়ে আছে। এই গুণেই গাঁয়ের পাটিল সে। গ্রামের বিপরীত প্রান্তে থাকে। দূরে থাকলেও সূর্য পাহাড়ের ধারের এক দুর্বিনীত দুরন্ত মেয়ের খবর তার কানে। আগেই এসেছিল।

এর বিহিত করতে গিয়েই এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটল। শুনে গ্রামবাসীরা অন্তত তাজ্জব বনে গেল। পাটিল কেশরকর নিজে এলো ভবানীর অন্ধ বাপের সঙ্গে দেখা করতে, সেই সঙ্গে তার দৃপ্ত মেয়েটাকেও দেখল। ডাকতে হয় নি, বাপের বিচার হবে কথাটা কানে আসতে কোমরে হাত দিয়ে নিজেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর বৃদ্ধ মোড়লকে আরো দুই-একদিন এসে মেয়ের বাপের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে দেখা গেল। অন্ধ বাপ তার দু-হাত ধরে আনন্দে গদগদ।

পাটিল একটা বিহিতের মতোই বিহিত করল বটে। শুনে প্রথমে হাঁ হয়ে গেল সবাই। কেশরকর নিজের ছেলে মহেশকরের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছে ভবানীর।

প্রথম বিস্ময় কাটতে সকলের হাড়ে হাতাস লাগল। মেয়েটা মোক্ষম জব্দ হবে এইবার।

ঈর্ষার বদলে তাদের এই আনন্দেরও বিশেষ একটা কারণ আছে। মহেশকর বিপত্নীক। বছর দেড়েক হল, ওর বউ রাণীবাঈ আত্মহত্যা করেছে। রাণীবাঈয়ের রূপ ছিল। সেই রূপের জোরেই বোধহয় দুর্দান্ত একরোখা মহেশকরকে সে বশ করতে পেরেছিল। দুজনে দুজনকে ভালোবাসতও খুব। সেই রাণীবাঈ আত্মঘাতিনী হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তার নিন্দা করে নি, বরং তাকে মহীয়সী বলেছে। আত্মঘাতিনী হবার কারণ, ছেলেমানুষি কৌতূহল নিয়ে সে কার্তিক পুজো দেখে ফেলেছিল। সংস্কার, সধবা স্ত্রীলোক কার্তিক পূজো দেখলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল বৈধব্য। রাণীবাঈ অতশত জানত না, পরে জানল। জেনে নিজের হাতে বৈধব্যযোগ খণ্ডন করে দিয়ে গেল।

মহেশকর ফৌজে চাকরি করে তখন, বিদেশেই থাকে। বীর-বংশের ছেলে বীরপুরুষই হয়–অল্প সময়ের মধ্যেই সে হাবিলদার হয়েছিল। সুযোগ সুবিধে পেলেই এবার বউকে নিয়ে আসবে ভাবছিল। তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। শুনেই দেশে ছুটল সে। তারপর চেষ্টাচরিত্র করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসল।

সকলেই প্রায় বউয়ের নামে ধন্য ধন্য করল তার কাছে। এমন কি মহেশকরের বাপ-মাও। কিন্তু দুই-একজন অতি নির্ভরযোগ্য পড়শী-বন্ধু তার কান বিষিয়ে দিয়েছিল। তারা আড়ালে জানালো রাণীবাঈ বৈধব্যযোগ খণ্ডন করার জন্য আত্মত্যাগ করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আগে কার্তিক পূজো দেখে ফেলার অপরাধে শ্বশুর-শাশুড়ীর গঞ্জনাও বড় কম ভোগ করে নি। একমাত্র ছেলের শঙ্কায় তারা বউয়ের ওপর বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

দুনিয়ায় শুধু এই বাপের মুখের দিকে চোখ তুলে কখনও কথা বলে নি মহেশকর। এরপরেও বলল না। কিন্তু বাপের সঙ্গে একটা নীরব বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে গেল।

আবার বিয়ের কথা শুনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠল মহেশকর। বাধার আভাস পেয়ে কেশরকর জানিয়ে দিল, বিয়ে না করলে বাপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অতএব মহেশকর বাধা দিল না। সে চাকরি করে না, বর্ধিষ্ণু বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেলে তার চলবে না। এই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত সে আর আপত্তি করল না। কিন্তু বাপের সুনজরে পড়ে রাণীবাঈয়ের জায়গা দখল করতে যে মেয়েটা আসছে– সব রাগ বিদ্বেষ গিয়ে পড়ল তার ওপর।

এদিকে সকলের হাড় জুড়লো, কারণ তারা ভাবল যোগ্যে যোগ্য মিলন হয়েছে। যেমন বেয়াড়া মেয়ে, তেমনি মুগুর জুটেছে। আক্কেল হয়েছে।

মহেশকরকে এখনও ভয়ই করে সকলে। ওই ছেলে ফৌজে চাকরি না করলে, বা এভাবে প্রথম বউ না মরলে, তার দাপটে গাঁয়ে টেকা দায় হত বোধ করি। যেমন রগচটা

তেমনি একরোখা! তবে ফৌজী দলে ছিল বলে, আর নিজেকে বীরপুরুষ ভাবে বলে, আগের সেই ছেলেমানুষি অত্যাচারের ঝোঁক গেছে। সমবয়সীরা এখন তাকে তোয়াজ করে চলে–গাঁয়ের খণ্ডোবার সঙ্গে তার তেজস্বিতার তুলনা দেয়। ঘোড়ায় আসীন অসি-হস্তি খণ্ডোবা হলেন দেশরক্ষক দেবতা–মহাদেবের অবতার।

মদের গেলাসের ইয়ার-বন্ধুরা ঠাট্টা করল–স্বয়ং ভবানী আসছেন, এবারে কার দাপট বেশি দেখা যাক।...এরও তাৎপর্য আছে, ভবানী হলেন গ্রাম-রক্ষয়িত্রী দেবী –প্রতি গ্রামেই ভবানী-মূর্তি আছে।

আশা সফল হল। বিয়ের মাস না ঘুরতেই দেব-দেবীর খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। একে তো কার জায়গায় এসে বসেছে নতুন বউ সেই হিসেব করে চলে না, তার ওপর চোখ রাঙাতে গেলে ফিরে যে-ভাবে তাকায়, তা বরদাস্ত করার মানুষ নয়। মহেশকর। তাছাড়া বাপ এনেছে বলে রাগ তো আছেই। ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করে না বলে। হাত নিশপিশ অনেকদিন থেকেই করছে, কিন্তু সেদিন মৃতা রাণীবাঈ সম্পর্কে কি একটা উক্তি করে বসতে আর সহ্য হল না। হাতের লোহার মতো পাঁচটা আঙুল ভবানীবাঈয়ের গালের ওপর ফুটে উঠল।

হতভম্ব ভবানী অতিকষ্টে চোখের জল সামলালো। দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে খরচোখে মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মহেশকর শাসালো, এই মুখে ফের ওই নাম আনবি তো মুখ একেবারে ভেঙে দেব।

সেই থেকে শুরু। ভবানী ওই নাম মুখে এনেও মার খেয়েছে, আর স্বামীর দাপটের ওপর দাপট করেও মার খেয়েছে। বউ শাসন করা একটা মনের মতো কাজ হয়েছে। মহেশকরের। আর ওই জেদী দুর্বিনীত মেয়েকে শাসন করার ব্যাপারে একটা সুবিধেও আছে। অত মার খেয়েও জোরে কাঁদে না, কাঁদেই না বলতে গেলে। আর শ্বশুরের কাছে নালিশও করে না। শ্বশুর বাড়ি না থাকলে সমান তালে রুখে ওঠে, ফলে আরো বেশি মার খায়। রাগে বিদ্বেষে ভবানীবাঈ এক-একসময় স্বামীর লোকান্তরিত প্রিয়া অর্থাৎ রাণীবাঈয়ের উদ্দেশেও কটুক্তি করে বসে। ফল কি হবে জেনেও করে। অন্ধ আক্রোশে কিল-চড় পড়তে থাকে তখন। ভবানীরও শক্ত সবল হাত আছে দুটো, যতক্ষণ সম্ভব যোঝে সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়তে হয়। অমন অসুর শক্তির সঙ্গে সে পারবে কেন!

কিন্তু হাল ছাড়লেও হার মানে না। ফলে মহেশকরের বউকে শায়েস্তা করার গোঁ আরো বাড়ে।

এই পুরুষের রাতের নিভৃত বাসনার মুহূর্তগুলিও কেমন নির্মম হিংস্র মনে হয়। ভবানীর। মহেশকর জঠরে মদ ঢেলে বাসনার তাপ জুড়তে চেষ্টা করে প্রথম। এক-একসময় বিফল হয় যখন, তখনই শুধু কাছে আসে। আর আসে যখন, ভবানীর ওপর দিয়ে একটা বড় রকমের ধকল যায়। নিষ্ঠুর জড় পেষণের মতো লাগে। মায়ামমতাশূন্য পরপুরুষ কবলিত মনে হয় নিজেকে।

বছর না ঘুরতে কেশরকর হঠাৎ চোখ বুজল। মহেশকরের বউ শাসনের স্বাধীনতা আর একটু বাড়ল। এই করে আরো দুটো বছর কেটে গেল। স্বভাবের ধাত বদলায় নি কারো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুজনেই কিছুটা শ্রান্ত।

দোলের দিন সেটা। এখানকার যোদ্ধাবংশীয়রা এই দিনে ঘটা করে বীর-উৎসব। করে। মহেশকরের বাড়িতেও এই বীর-উৎসব বহুকাল ধরে চলে আসছে। এ সবে মহেশকরের উৎসাহ খুব। শিবপূজাতেও সে বীরের মতো শোণিত-সুরার অর্ঘ্য দেয়। মদের পাত্রে নিজের বাহু কেটে অনেকটাই রক্ত দিয়ে ফেলে। প্রথমবার তার রক্ত দেওয়া দেখে ভবানী ভিতরে ভিতরে একটু শঙ্কিত হয়েছিল।

হোলির সন্ধ্যায় অতিথি-অভ্যাগতরা এসেছে মহেশকরের বাড়িতে বীর-পূজায় যোগ দিতে। একটু আগে মদ খেয়ে আগুনের চারদিকে নাচ-গান করেছে সকলে। মেয়ে-পুরুষে আগুনের চারদিক ঘিরে বসেছে। এইবার মৃত বীর ব্যক্তিদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হবে, তাদের যশের কথা, খ্যাতির কথা, বীরত্বের কথা বলে এই উৎসবে আবাহন করা হবে তাদের। বিশ্বাস, তাদের আত্মা আসে, এক-এক সময় কোনো একটি আত্মা এসে ভর করে তার পরিবারের বা অন্য কারো ওপর। ভর হলে মহা আনন্দের ব্যাপার। যার ওপর ভর হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে মৃত আত্মা তখন কথা বলে।

সকাল থেকেই ভবানীর শরীরটা অসুস্থ ছিল। সেও ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছে, থেকে থেকে ঝিমুনি আসছে।

মৃত আত্মার স্তুতি এবং আবাহনের মাঝামাঝি সময়ে দেখা গেল, সে হঠাৎ ঢলে পড়েছে! হাত-পা ছুঁড়ে কার সঙ্গে যেন যুঝতে চেষ্টা করল একটু, তার পরেই জ্ঞান। হারালো।

হকচকিয়ে গেল সকলেই। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। মৃত আত্মা রমণীর ওপরে ভর করে এ-রকমটা শোনা নেই বড়।

সহসা চমকে উঠল সকলে। ভবানীবাই আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। তার চোখমুখ স্বাভাবিক নয় খুব। উজ্জ্বল দুই চক্ষু মেলে সে চেয়ে আছে মহেশকরের দিকে।

-আমি রাণীবাঈ এসেছি!

সকলে নির্বাক। মহেশকর বিমূঢ় বিভ্রান্ত। এ-রকম কণ্ঠস্বরও যেন কেউ শোনে নি আর।

তেমনি স্থির স্পষ্ট স্বরে ভবানীবাঈয়ের মুখ দিয়ে রাণীবাঈ বলে যেতে লাগল, তার স্বামী বীর, বীর স্বামীর ভালোবাসার টানে সে কোথাও যেতে পারছে না; সর্বদা পাশে পাশে ঘুরছে। আজ সপত্নীর আশ্রয়ে সে স্বামীর কাছে এসেছে–এসেছে, কারণ। স্বামী সর্বদাই তাকে স্মরণ করছে। এই আশ্রয় সে সহজে ছাড়বে না, স্বামীর মন বুঝে দুঃখ-বেদনা বুঝে, সে মাঝে মাঝে আসবে।

ভবানীবাঈয়ের দুচোখ আবার ঘোলাটে হয়ে আসতে লাগল। মাথা আবার ঢলে পড়ল।

ঘরের মেয়ে-পুরুষেরা স্তব্ধ। মহেশকরের মুখে রক্ত নেই।

সকলে যখন চলে গেছে, সেই রাতে স্ত্রীর শুশ্রূষায় প্রথম বসেছে মহেশকর। পাখার বাতাস করেছে, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

ভবানীবাঈ চোখ মেলে তাকালো তার দিকে। মহেশকর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল–কেমন আছিস?

ভবানীবাঈ জবাব দিল না। ক্লান্ত দুই চোখ বুজে এলো আবার।

পরের ছ-সাত মাসে সত্যিই বার পাঁচেক রাণীবাঈয়ের ভর হল ভবানীবাঈয়ের ওপর। এবারে ভর যখন হয়, তখন আর বাইরের লোক কেউ থাকে না, শুধু বাড়ির লোক থাকে। রাণীবাঈ কথা বলে মহেশকরের সঙ্গে। মহেশকর চেয়ে থাকে। সব। শোনে। কথা বলে না।

দেখতে দেখতে মহেশকরের মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা গেল। স্ত্রীকে অর্থাৎ ভবানীবাঈকে মার ধর করা দূরে থাক, তার ওপর রাগ পর্যন্ত করে না। ভবানীবাঈ ইচ্ছে করে দোষ করলেও না। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসে, স্ত্রীকে আদর করতে আসে। ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে চায় না বেশিক্ষণ। তার মুখের রুক্ষ কঠিন ছাপটা ক্রমশই মুছে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিবর্তন কিছু ভবানীবাঈয়েরও হয়েছে। বিপরীত পরিবর্তন। কারণে অকারণে তার মেজাজ চড়ে। মহেশকরের হাসি দেখলে তার গা জ্বলে। আদর করতে এলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সে তো জানে এত আদর সোহাগ। ভালোবাসা কার উদ্দেশ্যে। সে তো উপলক্ষ মাত্র। শুধু সে কেন, মহেশকরের এমন পরিবর্তনের কারণ বাইরের লোকেরাও জানে। রাণীবাঈয়ের ভর হবার পরে সকল। বৃত্তান্ত অন্যেরাই ভবানীবাঈকে সাগ্রহে শুনিয়ে যায়।

ভবানীবাঈয়ের ভিতরে ভিতরে শুকনো টান ধরছে একটা। চোখ জ্বলে, মন জ্বলে, বুক জ্বলে। অসহ্য লাগে এক-একসময়।

.

আশ্বিনের দশেরার দিন এলো।

এই দিনের দিবাভাগে পুরুষেরা ঘোড়া পূজা, অস্ত্র পূজা, শাস্ত্রগ্রন্থ পূজা করে। মহেশকরের এ-সব অনুষ্ঠানেও ত্রুটি নেই। সন্ধ্যায় স্ত্রীরা কপালে নতুন সিঁদুর দিয়ে, মাথায় আতপ চালের ডালা রেখে স্বামীকে আরতি করে। তারপর তাকে আদর করে বসিয়ে নারকেল বাতাসা খেতে দেয়। স্বামী রুপোর টাকা দেয় স্ত্রীকে।

সন্ধ্যায় মহেশকর ঘরে বসে আছে। কিছুর যেন প্রতীক্ষা করছে সে। অদূরে মেঝেতে ভবানীবাঈ বসে। রুক্ষ, কঠিন মূর্তি। লোকটা বসে আছে বলেই তার রাগ।

স্ত্রীর ভাবগতিক সুবিধের না ঠেকলেও মহেশকর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল –আমাকে বরণ করবি না, আরতি করবি না?

জবাবে ভবানীবাঈ শুধু দুই চোখে আগুন ছড়ালো এক পশলা।

মহেশকর আবার বলল–এত ভালোবাসিস তুই আমাকে, আরতি করবি না? কর না–আমি রুপোর টাকা রেখেছি তোর জন্যে।

ভবানীবাঈ ঘোরালো চোখে তাকালো তার দিকে, বুকের আগুন মাথায় উঠেছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল–আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না, তোমাকে ভালোবাসে রাণীবাঈ।

বলতে বলতে হঠাৎ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে, একেবারে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসল। দিশেহারা ক্রোধে এতদিনের সব জ্বালা যেন উদগিরণ করতে লাগল। মহেশকরের হাসিমুখ ঝলসে দিয়ে বলতে লাগল–আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না, তুমি আকাট বোকা, তাই ভাবো রাণীবাঈ আসে তোমার কাছে তোমার কাছে কেউ আসে না, আমার ওপর কেউ কোনোদিন ভর করে নি–কেউ ভর করে না–সব আমি ইচ্ছে। করে করি, তোমার মতো বোকাকে ভোলাবার জন্যে আমিই সব করি–বুঝলে? আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি

আত্মঘাতী স্পর্ধাভরে ভবানীবাঈ চেয়ে রইল তার দিকে।
এইবার কি স্ত্রী-হত্যা ঘটে যাবে একটা?
কিন্তু পরমুহূর্তে ভবানীবাঈ হতভম্ব। ওই মুখে বিস্ময় বিরাগ ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। মুখের দিকে চেয়ে মহেশকর হাসছে। অনুরাগের ভরপুর হাসি।

বলল–আমি জানি, আমার কাছে কেউ কখনো আসে নি-আসে না। এই করে শুধু তুই-ই আসিস। আমাকে যদি ভালোই না বাসবি তাহলে নিজেকে খুইয়ে রাণীবাঈ হয়েও আমাকে পেতে চাস কেন তুই?

রাগ গেছে, ঘৃণা গেছে, ওই হাসিমুখের দিকে ভবানীবাঈ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে শুধু। দেখছে। চোখের কোণ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে, সর্বাঙ্গে কি এক অজ্ঞাত শিহরণ অনুভব করছে। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে ঘর ছেড়ে ভাঁড়ারের দিকে ছুটল সে–বরণডালা সাজাতে হবে।
আজ ভবানীবাঈ স্বামীর আরতি করবে।

একজন মিসেস নন্দী

মুখ না তুলেও ডক্টর বসু টের পেলেন আর একজন কেউ ঘরে এলেন।

ছোট মেয়েটার হাতসুষ্ঠু একটা আঙুল তাঁর এক হাতের থাবার মধ্যে। অন্য হাতে গ্লাস-স্লাইডে আঙুলের রক্ত লাগিয়ে নিচ্ছেন। মুখও চলছে। ছোট মেয়েটিকে ভোলাবার জন্যে অনেক হাসির কথা বলছেন। কিন্তু আঙুলে আচমকা পিনের খোঁচা খেয়ে আর রক্ত দেখে মেয়েটা ভরসা করে হাসতে পারছে না। ডক্টর বসু আর একটা গ্লাস-স্লাইডে ঘষে ঘষে এই স্লাইডের রক্তটা শুকিয়ে নিয়ে জোড়া-স্লাইড দুটো সামনের চামড়ার বাক্সের খুপরিতে রাখলেন। তারপর আগন্তুক দাঁড়িয়েই আছে মনে হতে ঘাড় ফেরালেন।

একজন মহিলা! বছর ত্রিশ-বত্রিশ হবে বয়েস।

এখানে অবারিত-দ্বার সকলের। পুরুষ আসে, মহিলা আসে–যার প্রয়োজন। সে-ই আসে। রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করানোর চার্জ এখানে কিছু বেশি। এই বেশিটুকু দেবার যাঁদের সংগতি আছে, বা কিছু বেশি দিয়েও যাঁরা সতোর ওপরে নির্ভর করেন।–তারাই আসেন। রোগের ব্যাপারে এ-রকম লোকের সংখ্যাই বেশি।

ডক্টর বসুর চকিত-বিভ্রান্ত, প্রায়-বিমূঢ় অভিব্যক্তিটুকু মহিলার পদার্পণের দরুন নয়। তার সামনেই তো আর এক মহিলা বসে। যে ছোট মেয়েটার রক্ত নিচ্ছেন, তার মা। ডক্টর বসুর পরিবর্তন এই একজনকে দেখেই।

-বসুন।

ঈষৎ ব্যগ্রমুখে মহিলা বলতে গেলেন–আমার বিশেষ একটু

-বসুন।

অর্থাৎ হাতের কাজ শেষ না করে তার শোনার অবকাশ নেই। ডক্টর বসু রাশভারী মানুষ। কম কথা বলেন। এক কাজের ফাঁকে আর এক কাজের কথা শুনে নেওয়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু যেভাবে বললেন, নিজের কানেই বিসদৃশ লাগল। কণ্ঠস্বর ঈষৎ অসহিষ্ণু রূঢ় শোনাল। এমন কি, বাচ্চা মেয়েটির মাও একবার ফিরে নবাগতাকে দেখলেন।

বিব্রত মুখে মহিলা একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

ধীরে-সুস্থে হাতের কাজ সারতে লাগলেন ডক্টর বসু। তিন জোড়া স্লাইডে রক্ত লাগানো, দুটো সরু টিউবে রক্ত টেনে আরকে মেশানো–এসব কাজে এমনই অভ্যস্ত যে চোখ বুজে করতে পারেন। অত গম্ভীর নিবিষ্টতায় সম্পন্ন করার মতো কিছুই নয়। আসলে মনটা তার এই কাজের দিকে নেইও। সুশ্রী রমণীটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্দরমহলে দুর্বোধ্য আলোড়ন শুরু হয়েছে একটা। তিনি কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছেন। কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।– কোনো একদিনের কোনো এক পুঞ্জীভূত বিরূপতার উৎসে হঠাৎ নাড়া পড়েছে যেন। অথচ এই উৎসটার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না আদৌ। এ-রকম বাত রাগের হেতু নিজেই জানেন না। নিজের অগোচরে স্মৃতির আয়নায় কোনো একখানি। মুখ ধরা আছে হয়ত। কিন্তু ধরা যে আছে সেটা অনুভব করলেন এই

সুযৌবনা রমণীটিকে একনজর দেখে। দেখামাত্র একটা বিমুখ প্রতিক্রিয়া অনুভব করলেন। অথচ আশ্চর্য, কাজের ফাঁকে নিজের নিভৃতে বিচরণ করেও তিনি ওই স্মৃতি-তটে পৌঁছুতে পারলেন না। কিছুই মনে করতে পারলেন না ডক্টর বসু।

ঘুরে বসে আর একবার সুন্দর মুখখানা দেখার ইচ্ছে। সুন্দর কিন্তু সুবাঞ্ছিতা নয়। ঘুরে বসলেন না। দেখার অবকাশ এক্ষুণি মিলবে। কিন্তু কার সঙ্গে কাকে মেলাবেন মনে না পড়লে দেখে কি করবেন? মনে পড়ছে না।

হাতের কাজ সারলেন। সরঞ্জামগুলো চামড়ার বাক্সয় গুছিয়ে রাখলেন। ছোট মেয়েটার মায়ের কাছ থেকে ফী নিলেন। পেশেন্টের বাড়ি যেতে হলে ডবল চার্জ, এখানে এলে অর্ধেক। তাকে বললেন, বিকেলে লোক পাঠিয়ে রিপোর্ট নিয়ে যেতে। মেয়ের হাত ধরে মা চলে গেলেন।

ডক্টর বসু ঘুরে বসলেন।

...সেই রকমই দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী।...গৌর তনু, রূপসী...সেই রকমই ঢলঢলে মুখ। সেই রকম বাঁকা সিঁথি।

কিন্তু কোন রকম? কার মতো?

-হ্যাঁ, বলুন।

সুন্দর মুখখানি ভারি শুকনো, ক্লান্ত, উৎকণ্ঠাভরা। এই রূপের আড়ালে –অনেকদিনের একটা দুশ্চিন্তা যেন থিতিয়ে বেঁধে আছে। স্বল্প প্রতীক্ষার দরুন ঈষৎ অধীরও। বললেন–আপনাকে দয়া করে এক্ষুণি একবার আমার বাড়িতে আসতে হবে, আমার ছেলেটির

-বাড়ি কোথায়?-কথার মাঝেই বাধা পড়ল।

–বেশি দূর নয়, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে–

ডক্টর বসু চেয়ে আছেন। লক্ষ্য করছেন। বাঁকা সিথির ফাঁকে সিঁদুরের আঁচড়, কমনীয় ভুরু, টানা চোখ। বললেন–গাড়ি একটা আমারও আছে, আপনি বাড়ির ঠিকানা। বলে যান, যাব–

মহিলা থতমত খেলেন একটু। এ-রকম গম্ভীর নির্লিপ্ততার কারণ খুঁজে পেলেন না। ঠিকানা দিলেন। তারপর সানুনয় অনুরোধ করলেন–কেসটা খুব আরজেন্ট ডাক্তারবাবু, আপনার ব্লাড-রিপোর্টের ওপর আমার ছেলের প্রাণ নির্ভর করছে।

বলতে বলতে টানা চোখের কোণদুটো একবার কেঁপে উঠল বুঝি। সামলে নিয়ে বললেন–বড় ডাক্তার বিশেষ করে আপনাকে দিয়ে ব্লাড় করানোর কথা বলে দিয়েছেন

ডক্টর বসু প্যাথলজিস্ট। রোগীর চিকিৎসা করেন না। রোগের বীজাণুর হদিস দেন। কিন্তু এই কাতরোক্তি শুনেই হোক বা তাকে আর একটু বসিয়ে, আরো একটু লক্ষ্য করে কোনো ভুলে-যাওয়া স্মৃতির দরজা খোলার তাড়নাতেই হোক, জিজ্ঞাসা করলেন–কি হয়েছে?

মহিলা সাগ্রহে জানালেন কি হয়েছে। জানিয়ে যেন ভরসা পেতে চাইলেন। কিন্তু ডক্টর বসু যা শুনলেন সত্যি হলে ভয়ের ব্যাপার। সাত বছরের ছেলে। রক্তের শ্বেত কণিকা অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে। লিউঁকিমিয়া। এই রোগ হলে বাঁচেই না বলতে গেলে। আগে অন্যত্র ব্লাড় করানো হয়েছিল। সেখানকার ওই রিপোর্ট ছিল। আজ আবার। একজন ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। তিনি একটু সংশয় প্রকাশ করেছেন, ওই রোগ নাও হতে পারে। অবিলম্বে তিনি আর একবার রক্ত-পরীক্ষা করাতে বলেছেন। আর বিশেষ করে ডক্টর বসুরই নাম করেছেন।

ডক্টর বসু শুনলেন। মায়ের ব্যাকুলতা দেখলেন। সুন্দর মুখে একমাত্র ছেলের মৃত্যুর ছায়া কাঁপছে। ডক্টর বসুর মনে হল তবু মেয়েটি যুঝছে–ছেলে বাঁচবে না বিশ্বাস করতে চাইছে না, মুখের ওপর ওই ছায়াটাকে বসতে দিতে চাইছে না।

কিন্তু তবু এই আকুতি যেন মর্মস্থলে পৌঁছুচ্ছে না ডক্টর বসুর। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, তিরিশ-বত্রিশের এই স্থিরযৌবনে দোলা লাগলে, এই সুন্দর মুখে হাসি ঝরলে, ওই টানা বিষণ্ণ চোখের গভীরে কটাক্ষের বিদ্যুৎ ঝলসালে কার সঙ্গে যেন মিলবে। যার স্মৃতি বাঞ্ছিত নয় আদৌ, যার স্মৃতি একরাশ বাষ্পীয় ক্ষোভের মতো অবচেতন মনের তলায় জমাট বেঁধে আছে।

কিন্তু কার স্মৃতি? ভেবে না পেয়ে ডক্টর বসু নিজেই অবাক!

-আপনি যান, আমি যাচ্ছি।

মহিলা এবারে হয়ত অন্যরকম আশা করেছিলেন। ভেবেছিলেন তার সঙ্গেই আসবেন। আবার অনুরোধের ভরসা না পেয়ে কাতর মিনতি-ভরা চোখে তাকালেন

-আপনি যান, আমার দেরি হবে না।

চলে গেলেন। গেট পর্যন্ত দেখা গেল। ডক্টর বসু দেখলেন। এই রমণীর চলা ফেরা, গাড়িতে ওঠা–মাধুর্য-ভরাই বটে। কিন্তু ডক্টর বসু তা দেখলেন না। মায়ের বিষণ্ণ করুণ মাধুর্য দেখলেন। আর, কি ঐক মস্ত মিলের মধ্যে ঠিক ততবড়ই একটা বিপরীত অমিল দেখলেন।

ডক্টর বসু মানুষটা বাইরে রুক্ষ হলেও নির্দয় নন আদৌ। বরং উলটো। তার কাজের নিষ্ঠা আর একাগ্রতা সুবিদিত বলেই বড় বড় ডাক্তাররা তার কাছে কেস পাঠান, তার রিপোর্টের ওপর অসংশয়ে নির্ভর করেন। যা শুনলেন, হাতের সব কাজ ফেলে তার তক্ষুণি ছোটার কথা, তবু উঠতে একটু দেরিই হল।

ডক্টর বসু ভাবছেন। ভাবা ঠিক নয়, অতীত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। নিজের এমন। অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার দরুন নিজেই হতভম্ব তিনি। ছেলেবেলায় অবশ্য খুবই আবেগপ্রবণ ছিলেন। একটু কিছু হলেই ভিতরে ভিতরে চাপা অভিমানে গজরাতেন। বাবাকে মনেও পড়ে না। শুধু মা ছিল। এই মাকে ঘিরেই যত মান-অভিমান। অথচ দু-দণ্ড ওই মা চোখের আড়াল হলে অন্ধকার দেখতেন চোখে।

বিগত দিনের পরিচিত মুখগুলো মনে করতে চেষ্টা করলেন ডক্টর বসু। কিন্তু এই মুখ মনে পড়ছে না। তার পরিচিতের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়, তাদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ

নেই বললেই চলে। দিবারাত্র কাজে ডুবে থাকেন, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেবার ফুরসতও মেলে না। অনভ্যাসের দরুন এখন অবকাশ পেলেও যান না কোথাও।

কোনো পেশেন্টের বাড়িতে কেউ তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল কিনা ভাবতে চেষ্টা করলেন। দু-দশটা বাড়ি থেকে রোজই কল আসে। গিয়ে রক্ত নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু এই ঠিকানায় কখনো গেছেন বলে মনে পড়ল না।

এ-ধরনের স্থূল ব্যাপার কিছু নয়, ডক্টর বসু নিজেই ভালো জানেন। সামান্য ঝগড়া-বিবাদে বা কারো দুর্ব্যবহারে এ-রকম প্রতিক্রিয়া তাঁর হয় না। নিজের যে চাপা আবেগটাকে তিনি খুব ভালো করে চেনেন, সেটাই কোনো কারণে আঘাত খেয়ে জখম হয়েছিল। অন্যথায় এ-রকম হতে পারে না। কিন্তু ও-ভাবে আঘাত দেওয়া দূরে থাক, ওই মেয়েও তো জীবনে তাকে এই প্রথম দেখল মনে হয়। অথচ এমন বিরূপতার মূলে এই মেয়ের সঙ্গেই যে নিবিড় যোগ কোথাও আছে, ডক্টর বসুর তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে সচকিত হলেন। আরো আগেই ওঠা উচিত ছিল। তাড়াতাড়ি গাড়ি বার করলেন।

.

বাড়ির নম্বর মিলিয়ে গাড়ি থেকে নামতে প্রথমেই দোতলার দিকে চোখ গেল। বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তারই প্রতীক্ষায় উদগ্রীব মনে হল। চোখাচোখি হতে ওপরে উঠে আসতে ইঙ্গিত করলেন তিনি। নিজেও রেলিং থেকে সরে গেলেন।

বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর মিশেল অভিজাত এলাকা এটা। ছবির মতো ছোট বাড়ি। বাড়ির গায়ে শুধু নম্বর ছাড়া কারো নামের চিহ্ন নেই। ভিতরে ঢুকেও মালিকের রুচির পরিচয় মেলে। বসার ঘরের ভিতর দিয়েই ঢুকলেন তিনি। পরিপাটি করে সাজানো। সুপরিচিত শৌখিন আসবাবপত্র। দেওয়ালে অজ্ঞাত শিল্পীর দুই-একটা হালকা রঙিন ছবি। মেঝেতে পুরু নরম কার্পেট।

ডক্টর বসু এগিয়ে যাবার আগে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য মহিলাটি নিজেই তরতর করে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে এলেন। তার আগে আরো একটি মাঝবয়সী রমণী সামনে। এসে দাঁড়িয়েছিল। খুব সম্ভব পরিচারিকা। কত্রীকে দেখে সে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।

আসুন ডাক্তারবাবু।

মহিলা আগে আগে ওপরে উঠতে লাগলেন। ডক্টর বসু তার দুই সিঁড়ি পিছনে। আবারও তাকে দেখামাত্র সেই অস্বস্তি, সেই বিরূপ অভিব্যক্তি। মনের এই অবস্থাটা যেন তার দখলের বাইরে। কোনো সুশ্রী মহিলার বাঁকা সিঁথি দেখলে এই রকম হয় কিনা। চিন্তা করে নিলেন। তক্ষুণি নিজেই আবার বাতিল করলেন চিন্তাটা। সিঁড়ি দিয়ে এভাবে নেমে আসা, ধীর পায়ে এভাবে ওঠা–এও যেন অচেনা নয়, অথচ তিনি চিনতে পারছেন না। তার চোখে এই তনুমাধুর্যও যেন অপরাধ।

ডক্টর বসু নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন। ভদ্রমহিলা ছেলের অসুখে চিন্তাগ্রস্ত, কাতর। আর তিনি কর্তব্যের ডাকে এসেছেন–এ-কথাই ভাবতে চেষ্টা করলেন। ওপরে উঠেও আরো জনা-দুই মেয়েছেলের মুখই দেখলেন, কোনো পুরুষের মুখ দেখা গেল না।

চারদিক খোলা একটা পরিচ্ছন্ন ঘরের মাঝামাঝি পুরু গদির খাটে রোগী শয়ান। সাত বছরের ফুটফুটে ছেলে। রোগের ধকলে বিবর্ণ, কিন্তু তাও সুন্দর। শিয়রের কাছে নার্স দাঁড়িয়ে।

ব্যাগ রেখে ডক্টর বসু তার সামনে বসলেন। চোখের কোল টেনে পরীক্ষা করলেন, আঙুলের ডগা টিপে দেখলেন। একটুখানি আশ্বাসের আশায় তার মা সশঙ্ক নেত্রে চেয়ে আছেন অনুভব করলেন। যেমনটা তখনো খোঁজায় মগ্ন, তাকে ডক্টর বসু জোর করেই যেন এবারে কাজের দিকে ফেরালেন।

ব্যাগ খুলে ধীরে-সুস্থে কর্তব্য সম্পন্ন করলেন। রক্ত নেওয়া হল। ডক্টর বসু উঠে দাঁড়ালেন। এবারে মহিলার সঙ্গে চোখোঁচাখি হতে মৃদু গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে বসলেন–আপনার নাম?

যেন রিপোর্ট লেখার জন্যই নামটা জানা দরকার।

–মিসেস নন্দী।

মিস্টার নন্দী কে বা কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করাটা আর রিপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত মনে হবে না। তাই জিজ্ঞাসা করা হল না, নইলে জানার ইচ্ছে ছিল।

মহিলা বিনীত অনুরোধ করলেন–ডাক্তারবাবু রিপোর্টটা যদি একটু তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়–যাবে না?

মায়ের এই কাতরতা আর উদ্বেগে তো ভেজাল নেই, তবু যেন কি দেখতে চেষ্টা করছেন ডক্টর বসু!

–তিনটে সাড়ে-তিনটেয় লোক পাঠাবেন।

–আমি নিজেই যাব, ওটা নিয়ে তক্ষুণি আবার–

বলতে বলতে ফীয়ের কথা মনে পড়ল। তক্ষুণি প্রায় ছুটেই ওধারের কোণের একটা টেবিলের ড্রয়ার খুলে কয়েকটা নোট হাতে ফিরে এলেন।–কত দিতে হবে। আমি তো

ডক্টর বসু জানালেন কত দিতে হবে। টাকা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বারান্দা, সিঁড়ি, সেই বসার ঘর, রাস্তা, নিজের গাড়ি। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আর একবার দোতলার বারান্দার দিকে তাকালেন। কেউ নেই। ডক্টর বসু নিজের ওপরেই বিলক্ষণ বিরক্ত। হয়ত কিছুই না, নিছক একটা কাল্পনিক আবেগের ধকল চলছে সেই থেকে। আর, কিছু হলেও এ-রকম আবেগপ্রবণতা ডাক্তারের অন্তত থাকা উচিত নয়।

– বাড়ি ফিরে ল্যাবরেটারিতে ঢুকলেন। এই কাজটাই আগে সারবেন। কাজ নিয়ে বসলেন। তন্ময় হলেন। যত পরীক্ষা করছেন, মায়ের মুখ সরে গিয়ে ছেলেটার মুখই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বুকের ভিতরটা কেমন খচখচ করছে ডক্টর বসুর।

শেষ হল। তার পরেও চুপচাপ বসে রইলেন খানিক। তারপর রিপোর্ট লেখায় মনোযোগী হলেন। হাতে লেখেন না, ছাপা ফর্মে একবারে টাইপ করে ফেলেন। টাইপ শেষ হল। খামও টাইপ হয়ে গেল।...মায়ের মুখখানাই চোখে ভাসল এবার।

সঙ্গে সঙ্গে কোন মন্ত্রবলে চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরে গেল যেন। আশ্চর্য, এতক্ষণ এত হাতড়েও যার হদিস মেলে নি, এক মুহূর্তে তাই যেন দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা ঘটনাস্রোত যেন পর পর চোখের সামনে দেখতে পেলেন ডক্টর বসু। খুব অভিনব ঘটনাও কিছু নয়, উলটে মামুলিই বলা চলে। কিন্তু যৌবনস্বরূপিণী রমণীর হিংস্র নির্মম প্রভাবটুকুই বোধ করি ওই ঘটনার অন্তরালে বুকের তলায় দুর্ঘটনার মতো চেপে বসেছিল ডক্টর বসুর। অবচেতন মন থেকে এতকালেও সেটা যায় নি।

দৃশ্যগুলো একে একে আবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন যেন!...একটি মেয়ে, ওই মিসেস নন্দী, সেদিন কি তার পরিচয় সেটা আজ আর মনে নেই–জীবন বাস্তবে আর যৌবন-বাস্তবে এক পুরুষকে সে চেয়েছিল। চাইতে গিয়ে চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে কিছু ফারাক আছে, সেই প্রথম অনুভব করেছিল। একটা কটাক্ষে, একটুখানি ভঙ্গিতে, ঠোঁটের এক টুকরো বিলোল হাসিতে যে দুনিয়া জয় করতে পারে, এই পরাজয় আগুন হয়ে তার বুকের তলায় ধিকি ধিকি জ্বলছিল। যাকে পেল না তার সুখের ঘরে আগুন ধরাবার জন্য সেই জ্বালা সে সন্তর্পণে পুষেছে। তারপর আগুন ধরিয়েছে। কামনার নগ্ন পঙ্কিলতার মধ্যে সে একদিন সেই ভাগ্যহত পুরুষকে টেনে নামিয়েছে, নামিয়ে তারপর জাহান্নমের পথে ঠেলে দিয়েছে। পুরুষের অসহায় স্ত্রীটি ছেলে-কোলে করে তার কাছে

এসে নতজানু হয়ে স্বামীকে ভিক্ষা চেয়েছে –ভিক্ষা মেলে নি। সুন্দরী রমণীর হিংসা, মাতৃত্বের সঙ্গেও তার আপোষ নেই।

সত্যি ঘটনা নয়, অবাস্তব বাংলা ছবি একটা।

কিন্তু এক যুগ আগে এই ছবি দেখেই ভিতরে ভিতরে ভয়ানক অস্বস্তি আর গ্লানি বোধ করেছিলেন ডক্টর বসু, তার ভিন্ন কারণ। রমণীর মাতৃত্ববোধশূন্য এই অসুন্দরের দিকটা এত দর্শকের মধ্যে শুধু তাকেই হয়ত বিশেষভাবে আঘাত করেছিল।

একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন তিনি। সিনেমা-টিমো বড় দেখেন না, কিন্তু নতুন বউ নিয়ে দৈবক্রমে সেদিন এই ছবিটাই দেখতে এসেছিলেন। আর দেখার পরে মনে হয়েছিল, এটা যেন তাঁর জীবনেই একটা কালো ছায়া বিস্তার করতে এগিয়ে আসছে।

প্রেম নয়, একটি মেয়েকে মনে ধরেছিল। ভিন্ন বর্ণের, ভিন্ন গোত্রের মেয়ে। সুশ্রী, সপ্রতিভ, মিষ্টি মেয়ে। সেও তাঁকে অপছন্দ করত না। কিন্তু মা বেঁকে বসেছিলেন। মা-ছেলে দুজনারই অভিমান বড় কম নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলে আর বিয়েই করে না দেখে মা-ই প্রথম ভেঙে পড়লেন একদিন। কেঁদে ফেলে বললেন–তোর যাকে খুশি নিয়ে আয়, ঘর সংসার কর, আমি আর বাধা দেব না, বউ এলে আমাকে কাশী পাঠিয়ে দিস।

ডক্টর বসু তারপর বউ ঘরে এনেছেন। নিজের যাকে খুশি তাকে নয়, মায়ের যাকে খুশি তাকে। মা পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন–তোদের জীবন খুব সুখের হবে দেখিস।

ডক্টর বসু বিশ্বাস করেছিলেন, মায়ের কথার থেকে বড় কিছু নেই। অ-সুখেরও নয় তার সংসার।

কিন্তু সেদিন ওই ছবি দেখে একটা বড় রকমের নাড়া-চাড়া খেয়েছিলেন ডক্টর বসু। বিয়েতে সেই মেয়েও এসেছিল, হাসিমুখে উপহার দিয়েছে, অভিনন্দন জানিয়েছে, নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে। ততটা তো এগোন নি ডক্টর বসু, কোনোরকম দাগ পড়ার। কথা নয়। তবু সেই মেয়ের চোখ-দুটো এক-একবার যেন বেশি চকচকিয়ে উঠছিল মনে হয়েছে। কদিনের মধ্যে এই ছবির প্রতিক্রিয়া। যাকে একদিন মনে ধরেছিল তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন ডক্টর বসু। সেই শ্রদ্ধার মেয়েকে ছবির এই মেয়ে কেমন করে যেন গ্রাস করেছিল। ভীতি-বিহ্বল চোখেই ছবিটা দেখেছিলেন। শেষে ছেলে নিয়ে এসে ভিক্ষা চাওয়া সত্ত্বেও যখন আর এক রমণীর মাতৃত্ববোধ বড় হয়ে উঠল না, সেদৃশ্য আর যেন সহ্য করে উঠতে পারছিলেন না ডক্টর বসু।

অভিনেত্রীটি অর্থাৎ আজকের মিসেস নন্দী এই ধরনের ভূমিকার সুপরিচিতা সেই আর্টিস্টই হবেন বোধ করি। কারণ, ছবি শেষ হতে অনেকের, বিশেষ করে স্বল্প মাসুলের দর্শকদের, অনেকরকম চটুল রসালো মন্তব্য শোনা গিয়েছিল। ছবির কষ্ট-কল্পিত আবেদনের থেকেও ছলা-কলাময়ী রমণী-যৌবনের সেই নির্মম স্থূল দিকটার আকর্ষণ যাদের কাছে অনেক বেশি।

ছবিটা দেখার পর থেকে ডক্টর বসু সেই মনে-ধরা মেয়েটির সঙ্গে কোনো যোগাযোগই আর রাখেন নি।

.

সাড়ে-তিনটের দু-পাঁচ মিনিট আগেই মিসেস নন্দী রিপোর্ট নিতে এলেন। শুকনো উদগ্রীব মুখ, আশায় আশঙ্কায় চাপা অস্থিরতা সুস্পষ্ট।

ডক্টর বসু নিঃশব্দে রিপোর্টের খামটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

খামটা হাতে নিলেন তিনি। চোখে কাতর প্রশ্ন, কি শুনবেন সেই শঙ্কায় সাহস করে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাও করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু চুপচাপ ফিরে যেতেও পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

–কি দেখলেন?—

আগের সেই প্রতিক্রিয়া আর অনুভব করছেন না ডক্টর বসু। বরং একটু বিচলিত বোধ করছেন।

–তেমন ভালো মনে হল না, আপনার ডাক্তারবাবুকে দেখান, তিনি বুঝবেন।

এক নিমেষে সমস্ত আশা যেন নির্মূল হয়ে গেল। স্থাণুর মতো মহিলা দাঁড়িয়ে রইলেন খানিক। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। নিঃশব্দ কান্না। নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গাড়িটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ডক্টর বসু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন।

.

প্রায় বছরখানেক পরে।

ডক্টর বসু বাংলা ছবি দেখতে এসেছেন আবার একটা।

কতকাল বাদে সিনেমা দেখছেন ঠিক নেই। হঠাৎ আসেন নি, অবকাশ বিনোদনের জন্যেও নয়, কাগজে এক রমণীমূর্তির বিজ্ঞাপন আর নাম চোখে পড়তে এসেছেন।

বহুকাল আগের সেই গোছেরই একটা ভূমিকা। তবে এই ছবিতে কিছুটা আত্মত্যাগের মিশেল আছে। হাস্যলাস্যময়ী এক রমণী নিজের যৌবনের অস্ত্রে এক প্রবল প্রমত্ত পুরুষকে বশীভূত করে তার কোপ থেকে এক সাধারণ মানুষকে রক্ষা করছে। ওই সামান্য মানুষটিই একদা তার অনুরাগের পাত্র ছিল।

ছবির প্রগলভ মুহূর্তগুলিতে অনেক হাসাহাসি, স্থূল মন্তব্য, কটুক্তি এমন কি সামনের দিক থেকে শিসও শোনা গেছে। কিন্তু ডক্টর বসু নির্বিকার চিত্তে দেখে গেছেন, দেখার পরে তেমনি নির্বিকার মুখেই প্রেক্ষাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এবারেও চটুল উক্তি কানে এসেছে দুই-একটা। কে একজন তার তরুণ সঙ্গীকে কনুইয়ের গুতো দিয়ে বলছে-কেমন রঙ-ঢঙ দেখলি–একখানা পার্ট দেখালে বটে!

সঙ্গী পালটা উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করল–তার থেকেও চোখের ভাষা দেখেছিস? মাইরি, যেন কটকট করে।

ডক্টর বসু নির্লিপ্ত মুখে নিজের গাড়িতে এসে উঠলেন। তিনি কিছুই দেখেন নি। আর দেখে থাকলেও এরই মধ্যে সব মুছে গেছে। তার চোখে শুধু একটা দৃশ্যই লেগে আছে। সে-দৃশ্য তারই বাড়ির নিচের একটা ঘরের। ছেলের ব্লাড-রিপোর্ট হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এক রমণী ঝরঝর করে কাঁদছে।

সেই মুখের সঙ্গে সকলের মায়ের মুখই খানিকটা করে মেলে বোধ করি।

ঝড়

খুব বেশি দিনের কথা নয়।

একদিনের মাত্র কয়েক ঘণ্টার প্রচণ্ড ঝড়ে শহর কলকাতার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় গাছগুলো শিকড় উপড়ে পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। পরদিন দেখে মনে হয়েছে যুদ্ধ-হত এক-একটা অতিকায় দানব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে অভিযোগ জানাচ্ছে। ভাঙা ডাল, ভেঁড়া তার আর উড়ন্ত টিনের চাল সরিয়ে চলাচলের পথ সুগম করতে এক সপ্তাহ লেগেছিল।

কিন্তু আমি সেদিনের কথাই বলছি। সেই প্রলয়-সন্ধ্যার কথা।

কাক চিল পটাপট মাটিতে আছাড় খেয়ে মরেছে। গাছ আর ভাঙা বাড়ি চাপ পড়ে অনেক লোক হতাহত হয়েছে। ট্রাম-বাস বন্ধ হওয়ায় বহু মেয়ে-পুরুষ পথে আটকে গেছে, আর ঘরে ফিরতে পারবে কিনা, সেই ত্রাস চোখ ঠেলে উঠেছে। যারা ভাগ্যক্রমে আগেই ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল তারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছে।

কিন্তু সেই সন্ধ্যাটাকে আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখি নি। কিছু শুনেছি, কিছু অনুমান করেছি। বাড়িতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সকলে দুটো করে চোখ কপালে তুলে নিরীক্ষণ করেছে আমি সেই লোক কি না, আমার হাত-পাগুলো সব যথাযথ আছে কি না। আশঙ্কা কাটতে মা-ই প্রথম মুখব্যাদান করেছেন- তুই এর মধ্যে এলি কি করে, বিপদ-আপদ হয় নি তো? এদিকে যে কাণ্ড, ঠাকুর রক্ষা করেছেন

দুই এক কথায় সকলকে আশ্বস্ত করে কাণ্ড শোনার দিকে মন দিতে চেষ্টা করেছি। নিজেকে ভুলতে হলে, নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে হলে, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার মতো ওষুধ আর নেই। কিন্তু সে পারা বড় শক্ত। আমারও সহজ হচ্ছিল না।

ঝড় থেমে গেছে, তাই এরা ঝড়ের গল্প করতে পারছে। কার কত বড় ফাড়া গেল তার রোমাঞ্চকর বিবরণ কানে আসছে। বিপদ হতে পারত বই কি, খুব বিপদ হতে পারত।

কিন্তু আমার বুকের ঝড় এখনো থামে নি। দেহের সবগুলো স্নায়ুতে টান ধরে আছে। ওদের কথা শুনতে শুনতে সেগুলিকেই শিথিল করার চেষ্টা। সহজ হওয়ার চেষ্টা।

আমি তখন আকাশে ছিলাম।

একটা মালবাহী প্লেনে। যার পাইলট ক্যাপ্টেন সিং। যোগীন সিং। আর একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার। কলকাতা থেকে কুচবিহার ট্রেনে প্রায় দুদিনের পথ, প্লেনে দেড় ঘণ্টার। খবরের কাগজের কাজে প্রায়ই তখন এদিকে আসতে হত। এই সূত্রে যোগীন সিংয়ের সঙ্গে আলাপ। মাসে চারবারও প্লেনে যাতায়াত করেছি। তাছাড়া দুই একবার আসাম বা বাগডোগরা থেকে ফেরার সময়ও যোগীন সিংয়ের প্লেন পেয়ে গেছি। ছোট একটা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান পাইলট যোগীন সিং। গোড়ার জীবনে তিন বছর মিলিটারীতে ছিল। সেই সুবাদে ক্যাপ্টেন। মিলিটারীর ওপরঅলাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে পার্মানেন্ট কমিশন পায় নি বা নেয় নি। প্রথম শর্তের মিয়াদ ফুরোতেই ছেড়ে এসেছে।

বনিবনা না হওয়ারই কথা। তার মেজাজের ওপর মেজাজ দেখানোর লোক থাকলে যোগীন সিংয়ের সেখানে টিকে থাকার কথা নয়। তার মতো পাইলট নিয়মিত সার্ভিসের অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানেও অনায়াসে মোটা মাইনের কাজ জোটাতে পারত। মাসে দু-দশ বার ইংল্যাণ্ড আমেরিকা করতে পারত। কিন্তু সে কাজ করতে হলে নিয়মের বশ হতে হয়, মেজাজও কিছুটা খাটো করতে হয়।

যোগীন সিংয়ের সঙ্গে চেনা-যাত্রী হিসেবে আমার আলাপ বটে, কিন্তু হৃদ্যতার আরো একটু কারণ ছিল। বছর তিন চার আগে খবরের কাগজে একটা ফ্রী-ফাইটের ছবি ছাপা হয়েছিল সেটা আজ আর কারো মনে নেই বোধহয়। কলকাতার বাইরের এক অভিজাত হোটেলে বয়সের গরমে আর টাকার গরমে তিনটি ধনী সন্তান নিজেদের ভাষায় এক বিদেশী তরুণী মহিলার উদ্দেশে তরল টিকা-টিপ্পনী কাটছিল। মহিলা ভাষা না বুঝলেও তাকে নিয়েই কিছু হচ্ছে বুঝে ক্রুদ্ধ এবং আরক্ত হয়ে উঠছিলেন। যোগীন সিং মদ খাচ্ছিল আর ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। উঠে গিয়ে প্রতিবাদ করতে ধনীর দুলালের তিনজনেই একসঙ্গে রুখে উঠল এবং মাতাল বলে কটুক্তি করে উঠল। একে তিনজন তারা, তায় স্বাস্থ্যও কারো খারাপ নয়! যোগীন সিং আর কিছু না বলে নিজের টেবিলে এসে মদের গেলাস খালি করল, তারপর উঠে চুপচাপ বাইরে চলে এল।

একটু বাদে চায়ের পাট শেষ করে আমি বাইরে এসে দেখি, যোগীন সিং নির্লিপ্ত মুখে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতে নিস্পৃহ উক্তি করল–হ্যালো।

আমিও বললাম, হ্যালো।

আলাপ তখনো এর বেশি নয়। এরোড্রোম থেকে বেরিয়ে অনেক সময় এক হোটেলে এসে উঠলেও, লোকটাকে অত মদ খেতে দেখে, আমি তেমন বেশি কাছে ঘেঁষি না। কিন্তু সেদিন আমার সাংবাদিক চোখে কি যেন একটা সম্ভাবনার অস্বস্তি দেখা দিল। ট্যাক্সি ধরার অছিলায় আমিও দাঁড়ালাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। নি। ভিতরের মহিলাটি আগেই চলে গিয়েছিলেন। লোক তিনটিও একটু পরেই বেরুল। তারপর ফুটপাথের ওপরেই খণ্ড যুদ্ধ। দুজনের নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল– তারা ফুটপাথে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তৃতীয় জন প্রাণ বাঁচিয়ে মোটরে উঠে চম্পট দিয়েছে।

আমি কিছুই করি নি। শুধু দাঁড়িয়ে দেখেছি, আর ঠিক যে মুহূর্তটির ছবি তোলা। দরকার, সেই মুহূর্তের একটা ছবি তুলেছি। তারপর ঘটনার বিবরণ লিখে কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।

এই থেকেই হৃদ্যতা। পরে যোগীন সিং হাসতে হাসতে বলেছে, তার উপকার করেছি আমি। সে অনেক জায়গা থেকে অনেক সাবাস পেয়েছে বলে নয়। লোকগুলোর টাকার জোর আছে, তারা কেস করত, অন্যভাবেও জব্দ করার চেষ্টা করত। কিন্তু খবরের কাগজে এভাবে ফলাও করে সব প্রকাশ হয়ে পড়াতে নিজেরাই গা ঢাকা দিয়ে আছে। খবরের কাগজ তার জোরালো সাক্ষীর কাজ করেছে।

আমি প্রীত হয়েছিলাম। কিন্তু এও জানি, যোগীন সিং কারো উপকারের পরোয়া না রেখেই যা করার করেছিল।

এরপর বাইরের এরোড্রোম থেকে বেরিয়ে সে যখন যে হোটেলে উঠেছে, আমাকেও সেখানেই টেনে নিয়ে গেছে। আমি বসে বসে তাকে অনেক মদ খেতে দেখেছি, কিন্তু মাতাল হতে দেখি নি। তাকে দেখলে বা কথাবার্তা বললে পাঞ্জাবী। বলবে না কেউ। দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই, আমাদের মতোই পরিষ্কার বাংলা বলে। ছেলেবেলা থেকে বাংলাদেশেই মানুষ।

যাক, বর্তমানের কথা বলি। কুচবিহার থেকে আমার ফেরার তাড়া ছিল। কিন্তু দুদিনের আগে প্লেনে সীট পাব, সে আশা ছিল না। ইতিমধ্যে যোগীন সিংয়ের প্লেন দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। সে আবার পরদিনই বিকেলে প্লেন নিয়ে ফিরছে জেনে, তাকে ধরলাম, নিয়ে যেতে হবে। যোগীন সিংও তক্ষুনি রাজী। তার এক টেলিফোনে ফেরার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কারো আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না, যোগীন সিং বলেছে যখন, মালের ওপর বসিয়ে নিয়ে গেলেও নিয়ে যাবেই জানি।–

পরদিন। দুপুর থেকে আকাশের অবস্থা ঘোরালো। কাগজেও ঝড়ের আভাস দিয়েছে। শাঁ শাঁ করে বাতাস বইছে, থমথমে মেঘের গুরু গুরু ডাকটা অন্যরকম।

যোগীন সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ওয়েদার, যাবে কি করে?

সে নির্ভাবনায় জবাব দিল, যেতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কলকাতায়?

মাথা নাড়লে। হাসলও একটু।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

এ ধরনের হাসি আমি চিনি। বললাম–তাহলে তো বেশ জটিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট মনে হচ্ছে, সময়ে না গেলে নিশ্চয় কোনো লেডির বিরাগ ভাজন হবার ভয় আছে?

যোগীন সিং আরো হেসে আরো বেশি মাথা ঝাঁকালে। আমার শোনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সদাব্যস্ত যোগীন সিংয়ের প্রণয় কথা ফেঁদে বসার মেজাজ ছিল না। টুকটাক দু-চার কথা মাত্র জানা গেল। মহিলার নাম যশোধরা। ক্রিশ্চিয়ান। মস্ত ব্যবসায়ীর মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের বড় অবস্থার সময় যোগীন সিং ও-মেয়ের পাত্তা পায় নি। বাপের ব্যবসা লাটে উঠতে খানিকটা সুবিধে হয়েছে। তখনো যোগীন সিংয়ের টান দেখে–না, টান আরো বাড়তে দেখে, যশোধরা বুঝেছে যোগীন সিংয়ের লোভ তার বাবার টাকার ওপর নয়, লোভ তারই ওপর। সে অনেক ব্যাপার

যোগীন সিং হাসি মুখে স্বীকার করেছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করলে রক্ষা নেই সেটা সত্যি কথাই। মেয়ের যেমন মেজাজ তেমনি অভিমান, একবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করার ফলে সে কি কাণ্ড!

যোগীন সিং অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কাণ্ডবিস্তারে আগ্রহ দেখা গেল না। একটু বাদেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ব্যস্ত পায়ে কোথায় চলে গেল। কিছু হয়ত মনে পড়ে থাকবে।

যথা সময়ে এয়ার অফিসে এসে হতাশ হলাম। এই আবহাওয়ায় প্লেন ছাড়বে। মনে হয় না। ঝোড়ো বাতাস ক্রমে বাড়ছে, আকাশের অবস্থা ভয়াবহ। এ সময় কুচবিহার থেকে ওই একটাই প্লেন ছাড়ার কথা। ছোট বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মালবাহী প্লেন। ছাড়বে কি ছাড়বে না এ নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। তবু ক্যাপ্টেন যোগীন সিং আসতে

অফিস থেকে তাকে জানানো হল, সব জায়গারই ওয়েদার রিপোর্ট খারাপ –টেক অফ করা ঠিক হবে না।

যোগীন সিং কান দিলে না, নিঃশঙ্ক জবাব দিল–ও কিছু না, উপর দিয়ে চলে। যাব।

আমার ভয় ধরল একটু। এক ফাঁকে তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম–এর মধ্যেই তুমি যাবে?

-তুমি থেকে যাও না, কাল যেও!

নিজের কাজে চলে গেল। দ্বিধা কাটিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করলাম। প্লেন যাবে, যোগীন সিং যাবে, এত মালপত্র যাবে, সঙ্গে যাত্রীও যাবে আরো–এর মধ্যে নিজের প্রাণটার জন্য এত ভাবতে লজ্জা করল। তাছাড়া সত্যিই বিপদের সম্ভাবনা। থাকলে যোগীন সিংই বা রওনা হতে চাইবে কেন?

প্লেন উঠল। আমরা চারজন মাত্র যাত্রী। এ ছাড়া পাইলট, কো-পাইলট এবং দু-চারজন ক্রু। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের, অর্থাৎ যাত্রীদের অবস্থা সঙিন। মালবাহী প্লেনের বসার আসনের ব্যবস্থা প্যাসেঞ্জার প্লেনের মতো নয়। মালের সঙ্গে খানিকটা মালের মতো হয়েই আসা। তবে কোমরে বাঁধার বেল্ট গোছের কিছু আছে। সামনেই মুহুর্মুহু লাল আলো জ্বলছে, ফ্যাসন ইওর বেল্ট-বেল্ট বেঁধে বসুন। কিন্তু ওই বেল্ট বাঁধা সত্ত্বেও স্থির হয়ে বসে থাকা অসম্ভব।

বাইরে ঝড় কতটা হচ্ছে টের পাচ্ছি না। কিন্তু ঝাঁকানি দোলানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘড়ি দেখলাম। সময় অন্যায় আমরা কলকাতার ওপরে এসে পড়েছি। কিন্তু কিছুক্ষণের। মধ্যেই ভয় আর ত্রাসে শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল। অনেক উঁচু দিয়ে প্লেনটা চক্রাকারে ঘুরছে। নীচে নামার এক একটা চেষ্টার মুখে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড-আমরা কে কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছি ঠিক নেই। মনে হচ্ছে ঝড়ের মুখে কুটোর মতো এখুনি সব নিঃশেষ হয়ে যাবে।

চোখের সামনে মৃত্যু দেখছি আমরা। মৃত্যু প্রতীক্ষা করছি। এরই মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব এড়িয়ে কোনোমতে প্লেন সম্ভবত অনেক উঁচুতে উঠে স্থির হল একটু। ভিতরে সকলে চিৎকার করে বলাবলি করতে লাগল, প্লেন আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক, যেখান থেকে এসেছি সেইখানে, অথবা যে-কোনো দূর দূরান্তে যেখানে ঝড় নেই। আমিও একমত, কিন্তু জানাব কাকে?

জানাবার সুযোগ হল। কি কারণে মিনিট দুইয়ের জন্য কো-পাইলটের হাতে প্লেন ছেড়ে একবার ভিতরে এল ক্যাপ্টেন সিং। মনে হল, ভগবান আমাদের আরজি শোনাবার জন্যেই তাকে ভিতরে পাঠালেন। বিপদ সম্বন্ধে আমরা বেশি বুঝি, কি সে বেশি বোঝে সেই জ্ঞানও তখন আমাদের নেই। শুধু বাঁচতে চাই, বাঁচার আকুতি।

অন্য যাত্রীরা তাকে দেখেই চেঁচামেচি করে উঠল। তারা আশ্বাস চায়, বাঁচার আশ্বাস। প্লেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলল তারা। কিন্তু অনুভূতিশূন্য পালিশ-করা মূর্তি যোগীন সিংয়ের। কারো কথার জবাব দিলে না। ভিতরের একটা ছোট্ট খুপরির মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আর দু মিনিট বাদেই বেরিয়ে এল।

এইবার তাকে দেখা মাত্র আমার ত্রাস আরো বেড়ে গেল। কারণ আমার মনে হল, ওখানে গিয়ে সে গলায় খানিকটা মদ ঢেলে এলো। সত্যি মিথ্যে জানি না। কিন্তু আমার তাই মনে হল, বিশ্বাস হল। রাগে ক্ষোভে আর ভয়ে দেহ অবশ। মনে হল, এক বদ্ধ পাগলের পাল্লায় পড়েছি আমরা। এই দুর্যোগ থেকে আর অব্যাহতি নেই, প্রাণের আশা নেই।

যোগীন সিং ভিতরে চলে গেল। কোথা দিয়ে কোথায় উড়ছি জানি না, তবে প্লেনের দাপাদাপি অপেক্ষাকৃত কম। ভাবতে চেষ্টা করলাম, হয়ত আমার অনুমান মিথ্যা, যোগীন সিং হয়ত কোনো কাজেই ওই খুপরির মধ্যে ঢুকেছিল। ডিউটির সময় মদ খাবেই বা কোন সাহসে। আশা করতে ভালো লাগল, আমরা হয়ত কোনো নিরাপদ স্থানেই ফিরে চলেছি। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। কোন দিকে চলেছি কিছু ঠাওর করা যাচ্ছে না।

অকস্মাৎ মিনিট কয়েকের জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যুর বিবরের মধ্যেই যেন ঢুকে পড়লাম আমরা। দেহের সব রক্ত প্রবল বেগে শিরশির করে উঠতে, বুঝলাম শাশা করে নীচের দিকে নামছে প্লেন। ঝড়ের সামান্য একটু বিরতির অপেক্ষায় ছিল যোগীন সিং। তারপরেই সব বোঝাবুঝির বাইরে আমরা।

দশ মিনিট গেছে, কি দশ ঘণ্টা গেছে, কি অনন্তকাল গেছে–কিছুই জানি না। একসময় সচেতন হয়ে দেখলাম প্লেন থেমে আছে, আর আমরা বেঁচে আছি। সেটা এমনই বিস্ময় যে চট করে বিশ্বাস হয় না।

দরজা খোলা হতে বাইরের দিকে চেয়ে আরো বিস্ময়। এরোড্রোমেই নেমেছি আমরা। ঝোড়ো হাওয়ায় তখনো দুপায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ানো শক্ত। এই বিপদ দেখেই ছোট একটা গাড়ি এসে আমাদের প্লেনের চত্বর থেকে তুলে নিয়ে অফিসে এনে ছেড়ে দিল।

সর্বাঙ্গ অবসন্ন। শান্তি। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে জীবনের আলোয় ফিরে আসার শান্তি। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ার মতো শান্তি।

কিন্তু যাব কী করে? এ প্যাসেঞ্জার প্লেন নয় যে কোম্পানির গাড়ি করে তাদের এয়ার অফিস পর্যন্ত অন্তত পৌঁছে দেবে। এদিকে প্লেন চলাচল সব বন্ধ, অন্য কোনো কোম্পানীর গাড়িও যাতায়াত করছে না। বাসও নেই। নির্জীবের মতো এরোড্রোমের রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক কাপ কড়া কফি নিয়ে বসলাম। প্রাণে যখন বেঁচেছি, সমস্ত রাত এখানে কেটে গেলেও খুব আপত্তি নেই।

-হ্যালো।

যোগীন সিং। মুখ লাল, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসির আভাসও একটু। যে লোকের খপ্পরে পড়ে প্রাণ যেতে বসেছিল, তাকে দেখেই আবার অন্য আশা জাগল। যোগীন সিংয়ের ছোট গাড়ি আছে একটা। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট

সাউথে, না এদিকেই?

–সাউথে। কেন?

–আমাকে যতটা সম্ভব এগিয়ে দাও না, যাব কি করে?

ঘড়ি দেখল। তারপর পিঠ চাপড়ে বলল–কাম অন–

একটি কেবিনের দিকে এগোল সে। কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে আমিও তার সঙ্গে কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম। যোগীন সিং দুজনের খাবারের অর্ডার দিল। খাবার না আসা পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল। কিছু ভাবছে মনে হল।

খাবার আসতে পরদা টেনে দিয়ে কিট থেকে মদের বোতল বার করল। আমি অবাক। প্রেয়সী সন্নিধানে যাবার আগেও এ বস্তু গলাধঃকরণ করতে পারে ভাবি নি।

খেতে খেতে ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে বলল, দুর্যোগে ওখানকার নিষেধ সত্ত্বেও প্লেন ছেড়েছি বলে আমার বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়া হবে শুনছি। ইডিয়েটস্!

ঈষৎ রক্তিম দেখালো মুখ। যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলাম তা আর স্মরণ করতে ইচ্ছে করে না। তবু বললাম–এভাবে প্লেন না ছেড়ে আর একটু দেখে নিলেও তো পারতে।

–দেখতে গেলে আর প্লেন নিয়ে ওঠাই যেত না, সে আমি আকাশের অবস্থা। দেখেই বুঝেছিলাম। সে জন্যে পাঁচ মিনিট আগেই প্লেন স্টার্ট দিয়েছিলাম।

অর্থাৎ সব জেনেশুনেই সে প্লেন ছেড়েছে। এ রকম লোককে কিই বা বলি।

যোগীন সিং নিবিষ্ট মনে আহার করছে। আর মদ খাচ্ছে। যেভাবে খাচ্ছে, মনে হল ধীরে সুস্থে গোটা বোতলটাই শেষ করবে।

বললাম– এসে যখন এই বিপদ দেখলে তখনই বা প্লেন ফেরালে না কেন? সাঘাতিক কাণ্ড হতে পারত

বিরক্তির সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল, ফিরব বলে প্লেন ছেড়েছিলাম? তোমাকে তো বলেছি আজ না এলেই নয়।

অর্থাৎ তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এক রমণী তার জন্য অপেক্ষা করছে, বা করবে। এদিকে নিশ্চিন্ত মনে সে পানাহারে মগ্ন। আমি হতভম্ব। এই দুর্যোগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখতে পারলে এক পাগল ভিন্ন আর কেউ রাগ করে না। বিশেষ করে যে লোককে আকাশ-পথে উড়ে আসতে হবে।

কিছু শোনার জন্যেই টিপ্পনীর সুরে বলতে ছাড়লাম না, এইদিনে না যেতে পারলেও কি তিনি বুঝতেন না?

মাথা নাড়ল। বুঝত না। বলল, বড় অবুঝ মেয়ে, বোঝাবুঝির মধ্যে নেই। একবার এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করে যে দুর্ভোগ হয়েছে, সে যদি জানতে পড়বি তো পড়, আজ আবার সেই দিন, সেই তারিখ।

ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছি। কুচবিহারেও একবার বলেছিল, অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখতে পারলে রক্ষা নেই, মেয়ের যেমন মেজাজ তেমনি অভিমান–একবার সময়মতো যেতে না পারার ফলে কি কাণ্ডই না হয়েছিল। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে সেই আসাই এলো বটে। কিন্তু এসে এখানে বসে মদ গিলছে। সত্যি কথা বলতে কি, যে মেয়ে

যোগান সিংয়ের মতো বেপরোয়া লোককে এভাবে নাকে দড়ি বেঁধে টেনে আনতে পারে, তাকে একটিবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল

জিজ্ঞাসা করলাম, তা এসেও তুমি এখানে দেরি করছ কেন?

সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, সাড়ে আটটায় যাবার কথা।

এমনভাবে বলল, কেন ওই সময়ের দু-দশ মিনিট আগেও যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এমনও হতে পারে, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কোনো সময়ে ওদের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। হয়ত ঠিক সময়ে রমণীটি অভিসারে আসবেন।

ঘড়ি দেখলাম। সাতটা বাজতে তখনো পাঁচ মিনিট বাকি। জিজ্ঞাসা করলাম কথা না রাখতে পেরে একবার খুব মুশকিলে পড়েছিলে বুঝি?

-খুব। আজকের এই দিনেই

মদ খাচ্ছে বলেই হয়ত ওর চোখের পাতা ভারি ঠেকছিল। আর মদ খাচ্ছিল। বলেই হয়ত সেই মুশকিলের কথা সহজে জানা গেছে। কিন্তু মোটামুটি শোনার পরেও সেই মুশকিলটা এমন প্রাণ তুচ্ছ করে ছুটে আসার মতো মনে হয় নি আমার। যোগীন সিংয়ের মতে যশোধরার ব্যবসায়ী বাবা লোকটা আদৌ সুবিধের নয়। মেয়েকে টোপ করে মস্ত পয়সাঅলা জামাই গাঁথবার মতলব ছিল তার। ওই করে শেয়ারবাজারের ঘা সারাবে ভেবেছিল। কিন্তু মেয়ের জন্যেই তা হচ্ছিল না। মেয়ে ওদিকে বাপের কাছে একজন মস্ত

মানুষ বানিয়ে রেখেছে যোগীন সিংকে। মস্ত টাকার মানুষ। নয় মানুষের মতো মস্ত মানুষ। তার এক গোঁ তাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না।

নিরুপায় হয়ে বাপ তখন সামনাসামনি যোগীন সিংয়ের সঙ্গে একবার কথাবার্তা কয়ে বুঝে শুনে নিতে রাজি হয়েছিল। সেও অনেক দিন অনেক চেষ্টার পর মেয়ে বাপকে এই সাক্ষাৎকারে রাজি করাতে পেরেছিল। দিনক্ষণ ঠিক হল। কিন্তু এমন কাণ্ড, বলতে গেলে একরকম অকারণেই যোগীন সিং আসতে দেরী করল। এমন কিছু দেরী নয়, মিনিট বারো-চোদ্দ। ঘোড়েল বাপ ঘড়ি ধরে ঠিক দশটি মিনিট অপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল। যোগীন সিং গিয়ে দেখে যশোধরাও নেই। ব্যাপারটা শুনল তার মায়ের কাছে। বাপ বেরিয়ে যাওয়ার পর রাগে জ্বলতে জ্বলতে মেয়েও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

সম্ভব অসম্ভব অনেক জায়গায় যোগীন সিং খুঁজে বেড়াল তাকে। আর বাপটাকে মনে মনে ধরে আছড়ালো বারকতক। ঘণ্টাখানেক বাদে নিজের বাড়িতে এলো দেখতে, যশোধরা সেখানে অপেক্ষা করছে কি না। এসে শুনল, টেলিফোনে খবর এসেছে। যশোধরা হাসপাতালে আছে। রাগে আর অভিমানে মেয়ে এমন গাড়ি চালিয়েছে যে সরাসরি অ্যাকসিডেন্ট।

হাসপাতালেও এই মেয়ে সহজে মুখ ফিরিয়ে তাকায় নি তার দিকে। যোগীন সিং অনেক ক্ষমা চেয়ে, অনেক নাক-কান মলে জীবনে আর কোনোদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করবে না প্রতিজ্ঞা করে তবে তার মুখে হাসি ফোঁটাতে পেরেছিল।

মনে মনে বললাম, যেভাবে এসেছ জানতে পারলে আজও একবার নাক-কান। মলে তোমাকে আবার কিছু প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, অত মদ যে খাচ্ছে তাই বা ওর প্রেয়সী বরদাস্ত। করবে কি করে। কিন্তু তার আগে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে সচকিত হলাম, সাতটা পঁয়ত্রিশ। এখন না উঠলে সে সাড়ে আটটায় পৌঁছবে কি করে? ঘড়ির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একটুও তাড়া দেখা গেল না। অস্ফুট জবাব দিল, সময় আছে। অন্যমনস্কর মতো আবারও কিছু ভাবছে মনে হল।

আরো ঠিক দশ মিনিট কাটল এইভাবে, আমি উসখুস করছি, অবাকও হচ্ছি। মদের নেশায় সময়ের গণ্ডগোল হয়ে গেল?

পৌনে আটটা।

এসো।

বোতলে আরো খানিকটা আছে, সেখানেই পড়ে থাকল। বড় বড় পা ফেলে। গাড়িতে এসে উঠল। পাশে আমি। পিছনে দেখলাম এক গোছ ফুল রয়েছে। এই দিনে ফুল কোথা থেকে সংগ্রহ হল ভেবে পেলাম না।

গাড়ি ছুটেছে।

হেড লাইটে রাস্তার অবস্থা দেখে আমার দুই চক্ষু স্থির। ঝোড়ো বাতাস আর নেই, বৃষ্টি পড়ছে। ভাঙা ডাল আর গাছের পাতায় সমস্ত রাস্তা ঢেকে গেছে। কোথাও মস্ত মস্ত টিনের চালা পড়ে আছে–তার ওপর দিয়েই মড় মড় শব্দে গাড়ি পার হতে টের পাচ্ছি বস্তুটা কি।

এ-রকম রাস্তায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দমদম এরোড্রাম থেকে দক্ষিণ কলকাতায় পৌঁছানোর সংকল্প শুনলেও লোকে পাগল বলবে। কিন্তু গাড়ির স্পীড দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তি বাড়ছে।

এক সময় স্বাভাবিক ভাবেই বলতে চেষ্টা করলাম, যে রাস্তা, তোমার সাড়ে আটটায় পৌঁছনোর প্রশ্নই ওঠে না–

জবাব দিল না। কিন্তু গাড়িতে স্পীড আরো বেড়ে গেল।

রাজ্যের ভয় আমাকে গ্রাস করতে এলো। এবারে মনে হল, আমি যথার্থই এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। একবার প্রাণে বেঁচেছি, এবারে আর রক্ষা নেই। প্রায় এক বোতল মদ গিলে গাড়ি চালাচ্ছে। কি করছে একটুও হুঁশ নেই নিশ্চয়। ক্ষোভে দুঃখে নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল। একবার ওভাবে বেঁচে, আর চোখের সামনে। অত মদ খেতে দেখেও কেন আমি যেচে সঙ্গে এলাম! মৃত্যু না ঘনালে এমন মতি হবে কেন আমার?

বাধা পেয়ে গাড়ি এক-একবার বিষম লাফিয়ে উঠছে। সামনে মস্ত মস্ত এক-একটা ডাল, বা হয়ত একটা আস্ত গাছই পড়ে আছে। স্পীড না কমিয়ে খেলনার মতোই অপরিসর ফাঁক দিয়ে গাড়িটা পার করে আনছে যোগীন সিং।

শ্যামবাজার পেরিয়ে সার্কুলার রোড ধরে নক্ষত্রবেগে গাড়ি ছুটেছে। রাস্তায় জনমানব নেই, পুলিশ নেই, অন্তত আমি কিছুই দেখছি না। আমি শুধু দেখছি, সামনে মৃত্যু। মৃত্যু হাঁ করে আছে।

ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার। দুহাতে তাকে জাপটে ধরে থামাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে কিছুই করতে পারছি না। পাথরের মূর্তির মতো বসে গাড়ি চালাচ্ছে সে। ওকে বাধা দেওয়ার থেকেও যেন মৃত্যুর গহ্বরে গিয়ে ঢোকা সহজ।

আমি তারই প্রতীক্ষা করছি। চকিতে একবার মনে হলো লোকটা বোধহয় আত্মঘাতী হতে চায়। এই জন্যই অমন দুর্যোগে অনায়াসে প্লেন ছাড়তে পেরেছে, আর এই জন্যেই এই গাড়ি নিয়ে এমন পাগলা ছোটা ছুটেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যাকসিডেন্ট হল না। গাড়ির গতি কমল। রাস্তার পাশে হঠাৎ এক জায়গায় ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। ঘড়িতে সাড়ে আটটা।

আমারও হুশ ফিরল যেন। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি পার্ক স্ট্রীটের এক জায়গায় এসেছি। তারপর হঠাৎ এক ধাক্কা খেয়ে বিমূঢ় আমি। ফুলের গোছা নিয়ে যোগীন সিং এখানে কোথায় নামছে! আমার শরীরের রক্ত এবারে দ্বিগুণ শিরশির করে পা বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

এপাশে সাদা দেয়াল-ঘেরা বিস্তৃত সমাধি-ভূমি। দুর্যোগের অন্ধকারেও এখানকার সমাহিত সাদাটে পরিবেশ চোখে পড়ে।

নিজের অগোচরেই মুখ দিয়ে কথা বেরুল, এখানে কোথায় যাচ্ছ?

ফুল হাতে যোগীন সিং থমকে দাঁড়াল একটু। শান্ত গভীর দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকালো। হঠাৎ আমার মনে হল, দুই চোখে কত জল জমাট বেঁধে আছে ঠিক নেই। ঝরছে না, শুধু চকচক করছে

বিড়বিড় করে বলল–এখানেই তো, হাসপাতাল থেকে সোজা নিয়ে এসেছিলাম তাকে, এখানেই আছে। বসো, বেশি দেরি হবে না–

শ্রান্ত পা দুটো টেনে টেনে সমাধিস্থানের দিকে এগিয়ে গেল সে।

আমি নির্বাক, নিস্পন্দ।

নাগরী

জানালার তলার পাট দুটো বন্ধ করে দিয়ে সেখানে বসে বসে মালা ভাবছিল, পুরুষের কি হৃদয় বলে বস্তু নেই?

মামার কথাগুলো মালা শুনেছে। এক মামী ছাড়া আর কারো শোনার কথা নয়। মামীকেই বাইরে দরজার আড়ালে পরদার এধারে দাঁড়িয়ে বলছিল। মালাও শুনছিল। তার শোনার তাগিদ ছিল। তার হাতে মামার জন্যে এক পেয়ালা দুধ ছিল। কেউ দেখে ফেললেও কিছু ভাবত না।

বেশী কিছু কথা নয়। মামা বেশী কথা বলে না। ও-বাড়িতে গিয়েছিল। ছেলের সঙ্গেই কথা হয়েছে। ছেলে দু-চার কথায় তাকে বিদায় করেছে। তার জ্যাঠামশাইয়ের অনুপস্থিতিতে তদবিরে গিয়েছিল বলেও প্রচ্ছন্ন বিরক্তি প্রকাশ করেছে। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জ্যাঠামশাইয়ের বিবেচনার ওপর আর কারো কোনো কথা নেই। কিছু অনুরোধ করার থাকলে তাকেই বলা দরকার।

মামা তবু আশা ছাড়তে পারে নি, তবু চলে আসতে পারে নি। বলেছে–তার কাছেই তো যাব বাবা, তবু তুমি মেয়েটিকে একবার দেখো না।

মামার শেষ আশা, তাকে ডেকে এনে সামনাসামনি একবার দেখাতে পারলে আর তারপর ঘরের অবস্থাটা খোলাখুলি ব্যক্ত করতে পারলে হয়ত শুভ সম্ভাবনাটা একেবারে ভেস্তে নাও যেতে পারে।

ছেলে কিন্তু সাফ জবাব দিয়েছে, তার দরকার নেই। সে স্পষ্টই বিরক্ত হয়েছে। ঘর থেকে চলে যেতে বলতে পারে নি। গম্ভীর মুখে নিজের কাজ নিয়ে বসেছে। সেটুকুই যথেষ্ট ইঙ্গিত। মামা চলে এসেছে।

মামা অপমানিত বোধ করেছে। যেটুকু করেছে, দায় উদ্ধারের আশাতেই করেছে। আর মামীর তাড়ায় করেছে। এতদিন এই চেষ্টা করছিল না বলে মনে মনে মালাই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল মামার ওপর। তার স্থির বিশ্বাস ছিল আসল লোকটার কাছে গিয়ে পড়লে তার জ্যাঠামশাইয়ের হিসেবনিকেশ সব শূন্যে মিলিয়ে যাবে। টাকা চাইলেই আকাশ থেকে টাকা পড়ে না, সেটা সে অন্তত বুঝবে। আজ সকালেও মনে মনে মামা-মামীর বুদ্ধির তারিফ করছিল সে। তারা যে ওই জ্যাঠামশাইটির অনুপস্থিতির প্রতীক্ষায় ছিল, আগে বোঝে নি। কাল রাতে নমিদি কথায় কথায় বলে গেছে, বাবা মক্কেলের কাজে চার-পাঁচদিনের জন্যে বাইরে গেছেন। ..মামা একদিনও সময় নষ্ট না করে আজই। গেছে।

রাগে দুঃখে চোখে জল আসার উপক্রম মালার। দাঁতের চাপে নীচের ঠোঁটটা কেটে বসার উপক্রম। হতাশার প্রথম ধাক্কায় আগে মামার অপমানটাই বুকে বিঁধেছে। এভাবে চেষ্টা করার ফলে মামাকে প্যাচালো লোক ভেবেছে ওরা। কিন্তু মামার মতো লোক যে হয় না, সেটা তার থেকে আর কে বেশী জানে।

বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক বিমলেন্দুবাবু।...বিমলেন্দু বসু। বয়েস হয়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ লো-প্রেসারে ভুগছেন। খাটুনি বেশী বলেই হয়ত। কলেজের পুরনো মাস্টার, মাইনে মন্দ নয় একেবারে। কিন্তু এ-বাজারে কিছুই নয়। তার নিজের সংসারটিও ছোট

নয় একেবারে। তার ওপর দুবছর হল চারটে ভাগ্নে-ভাগ্নী আশ্রিত। কলেজের খাটুনি, বাড়িতেও দুবেলা ছেলেরা আলাদা মাইনে দিয়ে পড়তে আসে। তার ওপর ফাঁক পেলেই নিজের পড়াশোনা। মালা এক-একসময় অবাক হয়ে ভাবে, মামার রক্তচাপ তো বাড়ার কথা, মাথায় সর্বক্ষণ রক্ত উঠে থাকার কথা!

মালার বাবা এক মফঃস্বল ইস্কুলের সহকারী হেডমাস্টার। কড়া নীতিবাগীশ, সাদাসিধে বেশবাস, মাথার চুল কদম-ছাট। তাঁর নীতির দাপটে ইস্কুলের ছেলেরা ভয়ে জড়সড়-বাড়িতে ছেলে-মেয়েরাও। দুই ছেলে দুই মেয়ে। মেয়ে দুটি বড়। মফঃস্বল ইস্কুলের সহকারী হেডমাস্টারের মাইনে সেই রকমই। মাসের শেষে সংসারের প্রায় অচলাবস্থা হত। সেই কারণেও মেজাজ সব সময় চড়া থাকত ভদ্রলোকের। তার স্ত্রী, অর্থাৎ মালার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই তাকে সংসার চালাতে না-জানার খোঁচা খেতে হয়েছে। বছর তিনেক হল ভদ্রমহিলা চোখ বুজেছেন।

আর বছর দেড়েক হল নীতিবাগীশ লোকটি সংসার চালনায় পটু নতুন ঘরনী এনেছেন। নতুন কী এসে অনটনের সংসারে ওই ছেলেমেয়েগুলোকে বাড়তি আপদ ভিন্ন আর কিছু ভাবেন নি। অমন বয়সের একজনের ঘরে আসার ফলে একটু বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম তার পাওনা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু চার-চারটে মুখ সামনে হাঁ করে আছে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য জুটবে কোথা থেকে? অতএব তারও মেজাজের সমাচার খুব কুশল ছিল না।

ছেলেমেয়েগুলোর দুরবস্থার কথা তাদের মামা বিমলেন্দুবাবু প্রথম শুনেছিলেন। এক বন্ধুর মুখে। ভগ্নীপতির আবার বিয়ে করার খবরটাই মস্ত ধাক্কা তার। বোনটাকে

ভালোবাসতেন তিনি–অনেক ছোট তার থেকে। তারপর যে-খবর শুনলেন, যদিও সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় খুব, কিন্তু তার আংশিক সত্য হলেও স্থির থাকা কঠিন।

বিমলেন্দুবাবুর অস্থিরতা লক্ষ্য করে তার স্ত্রী-ই একদিন জোরজার করে তাকে দেখতে পাঠালেন। সৎমা এলেই পাঁচজনে পাঁচরকম সন্দেহের চোখে দেখে, তিলকে তাল করে।

বিমলেন্দুবাবু গেলেন, আর বেড়াবার নাম করে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের একেবারে সঙ্গে করে ফিরলেন। তাঁর স্ত্রী আড়ালে যেটুকু শুনলেন তাতেই তার চোখে জল আসার উপক্রম। শুধু বললেন–নিয়ে এসে ভালো করেছ, এমন নির্লজ্জও মানুষ হয়!

দুবছর হল মালারা এসেছে এখানে। ষোল বছরে এসেছিল, এখন তার বয়েস আঠার। নিরাশ হবার মতো বয়েস নয় একটুও। গলির ওধারে ওই মস্ত দালানের ওই ঘরের লোকটা তাকে বাতিল করে দিলেও না। দুবছর ধরে এই কোণের জানালার। এখানটাই প্রধান আশ্রয় মালার। বারান্দার রেলিংয়ে গিয়ে দাঁড়ালেই বাঁয়ের দালানের পাজামা-পরনে ছেলেটার যেন রাস্তা দেখার দরকার হয়ে পড়ে। আর কোণঘেঁষা ডাইনের বাড়িটার ফেত্তা দিয়ে কাপড়-পরা সঙ্গীতজ্ঞ পুরুষটিও চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মালাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গান ভাঁজতে থাকে। অন্ধকার রাত না হলে মালার বারান্দায় দাঁড়ানো হয় না। আর রাতেও দেখা যাক না যাক, সে দাঁড়িয়ে আছে অনুভব করলেই দুদিক থেকে দুজনের আবির্ভাব ঘটে।

অতএব ঘরের কোণের জানালাটাই ভরসা মালার। সেখানে বসেই পড়ে বা বোনে, বা যা হোক কিছু করে। কখনো কপাট খোলা থাকে জানালা দুটোর, কখনো বা নিজের

সুবিধেমতো একটু আধটু। সবটা খোলা থাকে যখন গলির ওধারের ও-ঘরের বাসিন্দাটি অনুপস্থিত। জানালার এই কোণটি থেকে নীচের ওই ঘরটার ভিতরসুদ্ধ দেখা যায়। ওটা ঘর ঠিক নয়, বড় একটা হলঘরের মতো। ঘরের মধ্যে কাজের কত রকম সরঞ্জাম, কত রকমের ছবি। হলঘরের ভিতর দিয়ে যে ঘরটার আভাস, সেটা শোবার ঘর।

এই হলঘরটা রহস্যের মতো লাগে মালার। দুবছর ধরেই তাই লাগছে। সেখানে ঘরের মালিক যখন কর্মনিবিষ্ট, মালার এই কোণের জানালাটা তখন অল্প ফাঁক থাকে। ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে অবাক বিস্ময়ে দেখে মালা। অত নিবিষ্টচিত্তেও কাজ করতে পারে কেউ! সমস্ত দুনিয়াটা যেন অনুপস্থিত লোকটার কাছে। উপস্থিত শুধু ওই মস্ত ফ্রেমটা, আর তাতে আঁটা ক্যানভাসটা, আর পাশের রঙ-তুলি আর জলের বাটি। কখন নতুন ক্যানভাসে রঙ ছোঁয়ানো হল, আর কবে সেটা শেষ হল, মালা তার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানে। কিন্তু কি শেষ হল, সেটা জানার উপায় নেই। জানার জন্যে ছটফটানিরও শেষ নেই। ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে দেখে আসে। লোকটার মুখের তৃপ্তি দেখে বা বিরক্তি দেখে শুধু বুঝতে পারে, কোনটা মনের মতো হল, আর কোনটা হল না।

ইচ্ছে করলেই মালা ওই ঘরে ঢুকতে পারে, ইচ্ছে করলেই দেখতে পারে। নমিদি তো কতদিন তাকে যাবার কথা বলেছে। এই বয়সেই এত লজ্জা দেখে রাগ পর্যন্ত করেছে। কিন্তু রাজ্যের সংকোচ মালার। আর ওই ঘরে ঢোকা! বাবা রে বাবা! নমিদি। বলেছে, যখন তখন গৌতমদার ঘরে ঢুকলে তাকে সুষ্ঠু নাকি রাগ করে ঘর থেকে বার করে দেয়। আঁকা-টাকার গল্প উঠলে তার গৌতমদার প্রশংসায় নমিদি পঞ্চমুখ। তার মতে অমন শিল্পী আর আছে কিনা সন্দেহ! নমিদির থেকে মাত্র তিন বছরের। বড় খুড়তুতো দাদাটি। ওই বাড়িটার অর্ধেক মালিক। নমিদি এম. এ. পড়ে। তার এই দাদা বি. এস-

সি. ডিস্টিংশনে পাস করে আঁকার কলেজে ঢুকেছিল। সেখানেও আগাগোড়া ফার্স্ট। এই বয়সেই এখন সেই আঁকার কলেজে মাস্টারি করে। অবসর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের কাজ করে।

মামীর সঙ্গে খুব ভাব নমিদির। প্রায়ই গল্প করতে আসে। মালা যায় না বলে মামীকে অনুযোগ করাতে মামী অনেক দিন ঠেলে পাঠাতে চেষ্টা করেছেন তাকে। সে-চেষ্টার পিছনে মামীর একটু আশাও ছিল। মালা শেষে নমিদিকে বলেছিল–পরীক্ষাটা হয়ে গেলে যাবে।...নমিদি হেসে ফেলেছিল–এখান থেকে লাফালে আমাদের ঘরে। গিয়ে পড়বে-পরীক্ষার জন্য যেতে পারছ না?

পরীক্ষা, অর্থাৎ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। মামাই তোড়জোড় করে ওর পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন আর অন্য ভাইবোনগুলোকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলেন। ওর পরীক্ষার পর নমিদিরাই দু-তিন মাসের জন্য কোথায় যেন গিয়েছিল। কিন্তু মালা তারপর যাবে কি, লজ্জায় মুখ লুকোতে পারলে বাঁচে–সে থার্ড ডিভিশনে পাস করেছে।

পাস করার পরেও তাকে কলেজে ভর্তি করানো যায় নি। তার লজ্জাই বেশী। মামা আবারও বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু পড়াশোনা মালার কমই হয়। সামনে বই খোলা থাকে, এই পর্যন্ত। চোখ থাকে আধ-পাটখোলা জানালার ভিতর দিয়ে গলির ওধারের ওই বড় ঘরটার দিকে। খুব ক্লান্ত লাগলে লোকটা তুলি-টুলি ফেলে হাত-পা ছড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকে। আর সিগারেট একবার ধরল তো একেবারে দুটো তিনটে খাবে। মালা শুনেছিল বেশী সিগারেট খেলে গলায় ও বুকে অনেক সময় ব্যামো হয়। মালা ভুরু কোঁচকায়, কেন, কি দরকার অত সিগারেট খাবার!

জানালাটা যে সব সময় একেবারে মাপমতো বন্ধ থাকে তা নয়। এক-আধ সময় হয়ত খোলাই থেকে যায় অনেকটা। কাজে মন দিলে কোনোদিকে তো আর তাকাবে না লোকটা তাই সব সময় সতর্ক থাকার প্রয়োজন হয় না মালার। ফলে এক-একদিন দেখা হয়ে যায়, চোখখাচোখি হয়। তখনো খুব যে খেয়াল করে দেখে ওকে, মনে হয় না। মালা অবশ্য জানালাটা ঠেলেই দেয়। নমিদির মুখে নাম শুনেছে, গৌতম। গৌতমই বটে। মালার এক-একদিন ইচ্ছে হয়, স্কুল ফাইন্যালের ইতিহাস বইটা এনে গৌতমের ধ্যান অধ্যায়টা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। তারপর উদ্ভট ইচ্ছেটার কথা ভেবে নিজের মনেই হেসে বাঁচে না।

একদিন মালার দুই চক্ষু বিস্ফারিত। জানালা বন্ধ করতেও ভুল হয়ে গেল। একি কাণ্ড! ছোট ছেলের মতো একতাল কাদামাটি ছানাছানি করছে লোকটা। তাই দিয়ে কিছু একটা গড়তে চেষ্টা করছে, আবার তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে কাদার তালটাকে কিছু একটা আদলে আনার চেষ্টায় হাল ছেড়ে শেষে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। মালার তখনো খেয়াল নেই, সে হাঁ করে দাঁড়িয়েই আছে। লোকটার মুখে হাসির আভাস দেখে খেয়াল হয়েছে, হুড়মুড়িয়ে ছুটে পালিয়েছে সেখান থেকে।

মামী একদিন নমিদির কাছে ভাগ্নীর বিয়ের ভাবনাটা প্রকাশ করে ফেললেন। মালা কাছেই ছিল। নমিদির মন্তব্য কানে এল–ওর জন্যে আপনার ভাবনা কি, ওই চেহারার মেয়ে কটা হয়, যে দেখবে সেই লুফে নেবে।–এরপর আর একদিন মনের। বাসনাটা নমিদির কাছে প্রকাশই করে ফেললেন মামী। বললেন, দুরাশা তো বটেই, তবু ভাগ্নীর ওই চেহারাটুকুর জন্যেই ভরসা করে প্রস্তাবটা করা। গৌতম সোনার টুকরো ছেলে, এমন

ভাগ্য তাদের হবার নয়, তবু নমি যদি তাদের মুখ চেয়ে একটু চেষ্টাচরিত্র করে, যদি তার বাবাকে একটু বলে কয়ে দেখে।

রূপের যতই প্রশংসা করুক, এই আশা তারা করতে পারে সেটা নমিদি ভাবে নি বোধহয়। দূর থেকে তার মুখ দেখে সেই রকমই মনে হয়েছিল মালার। তবে কথা দিয়েছিল, বলে দেখব।

বলেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ভাইপোর জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখে গেলেন। নমির মা-বাবা। মেয়ে যে তাদের পছন্দ হয়েছে সেটা সেখানেই তারা নির্দ্বিধায় বলে গেলেন। মেয়ে মোটামুটি তারা নিজেদের ঘরে বসেই অনেকদিন ধরে দেখে আসছেন। সুখের ঘরে রূপের বাসা, কিন্তু এই ঘরে এই রূপ এল কেমন করে, তাই বোধ হয় মনে মনে অবাক হয়ে ভাবতেন তারা।

বিমলেন্দুবাবুকে কথাবার্তা বলার জন্য বাড়িতে আসতে বলা হল। মস্ত আশা নিয়ে তিনি গেলেন। কিন্তু তারপর মুখ অন্ধকার। আলোচনার ছলে মোটামুটি একটা ফর্দ পেশ করলেন নমির বাবা। সেই ফর্দ বিমলেন্দুবাবু তার নিজের দুটো মেয়ের বিয়েতেও মেটাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তার ওপর নগদ তিন হাজার এক টাকা পণ। দায়দায়িত্ব সবই জ্যাঠার যখন, ছেলেটা কোনোদিন না ভাবে জ্যাঠা তার পাওয়া থোয়ার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

বিমলেন্দুবাবুর মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। লো-প্রেসার কি হাই-প্রেসার বুঝছিলেন না। একটু সুস্থির হয়ে প্রথমে মেয়ের বাপের বাড়ির, পরে নিজের বাড়ির সংসারের চিত্রটা

তার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন–আপনাদের দয়ার ওপর নির্ভর

নমির বাবা নিরাসক্ত মুখে জবাব দিয়েছেন–তাহলে আর কি হবে।

তবু একটু অনুনয় করতে যাচ্ছিলেন বিমলেন্দুবাবু, কিন্তু ভদ্রলোক সেটা পছন্দ করেন নি। বলেছেন–এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি

না, কথা আর বাড়ে নি। তারপর মামীর তাড়নায় পড়ে এই শেষ চেষ্টাটা করেছিলেন বিমলেন্দু। ছেলেকে একবার এনে দেখানোর চেষ্টা। তারও এই ফল।

জানালা থেকে উঠে বাইরের বারান্দার রেলিংয়ে এসে দাঁড়াল মালা। এদিকে পাজামা-পরা লোকটা আর ওদিকের গায়ক গুটি-গুটি এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে টের পেল। দুদিকের দুজোড়া চোখ তাকে গিলছে, তাও উপলব্ধি করল। কিন্তু মালা ভাজ এই প্রথম দাঁড়িয়েই রইল। নির্লিপ্ত, উদাসীন। জগৎটাই যেন মৃত মূর্ছাতুর হয়ে পড়ে আছে তার সামনে।

এর মাস সাতেক বাদে এ-সংসারের সব থেকে অভিনব বিয়োগান্ত নাটকটা সুসম্পন্ন হয়ে গেল। মামা চোখ বুজলেন। লো-প্রেসারের স্ট্রোক। তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। জ্ঞান আর হয়ই নি। মামী ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলেন। মালা কাঁদতে পারে নি। কাঁদবে কেমন করে, কান্না শোনার কান কি ওই বিশাল বিস্তৃত মহাকাশে কোথাও আছে?

.

এ-কাহিনীর শেষ অধ্যায়ের সূচনা দশ বছর বাদে।

শহরের অভিজাত অঞ্চলে হয়ত সব থেকেই অভিজাত আদব-কায়দার হোটেল ওটা। এখানে পকেটের রসদের হিসেব কষে কেউ ঢোকে না। হিসেব জিনিসটাই অচল এখানে। এখানকার রাতের অঢেল যৌবন। এখানকার আলোর কণায় কণায় যৌবনের নেশা। বাঙালী মাদ্রাজী পার্শী শিখ নেটিভ-সাহেব খাস-সাহেব–সকল জাতের সকল বর্ণের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষদের অবসর-বিনোদনের বা শ্রান্তি-ক্লান্তি মোচনের জায়গা এটি। অর্থকৌলীন্যে যিনি যত বেশী মেজাজী কুলীন, তার তত সহজ আনাগেনা এখানে।

আইন? কানুন? সে-সবের কড়াকড়ি ছোট জায়গার জন্যে। বড় জায়গার স্পেশ্যাল পরোয়ানা। প্রয়োজন দেখাও, টাকা ঢালো–পরোয়ানা মিলবে। হোটেল কর্তৃপক্ষ রাতের মিয়াদ ভোরের দিকে টেনে নেবার জন্যে পরোয়ানা সংগ্রহে পিছ পা নয়, টাকা ঢালতে গররাজী নয়। কারণ তারা ঘরের টাকা ঢালছে না।

গৌতম দত্তর ছোট গাড়িটা হোটেলের সামনের ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল যখন, রাত তখন দশটার ওধারে। নিজেই ড্রাইভ করে। না, সে নিয়মিত আগন্তুক নয়। এখানকার। যা সে খুঁজছে, একজন বন্ধু তার হদিস দিয়েছিল। বলেছিল, দেখ গে, পছন্দ হবে হয়ত, যদি রাজী করাতে পার—

আজ নিয়ে পর পর এই তিন দিন আসছে সে। দুদিনই দেখা পেয়েছে, আজও পাবে হয়ত। পছন্দ হয়েছে। যতটা চেয়েছিল তার থেকেও বেশী পছন্দ। কিন্তু আলাপ করা হয়নি। প্রস্তাব করা হয়নি। চেয়ে চেয়ে দেখেছে শুধু।

এখানকার ক্ষণ-সহচরীদের একজন। বাঙালী মেয়ে। বাঙালী মেয়ে বোধহয় এই একজনই আসে এখানে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আছে, পার্শী আছে–সুন্দরীও বটে। সুন্দরী না হলে এখানে ঠাই মেলে না। শুধু রূপ থাকলে হবে না, বেশবাস, আচার-আচরণ, কথাবার্তায় সূক্ষ্ম মার্জিত রুচিবোধ থাকা চাই। তা-ই আছে সকলের। কিন্তু আর কারো দিকে চোখ পড়ে নি গৌতম দত্তর। ওই একটি মেয়ে ছাড়া। আশ্চর্য, এমন মেয়েও আসে এখানে!

গৌতম দত্ত নামজাদা শিল্পী। তার ছবি, তার মডেলিংয়ের আলাদা মর্যাদা। কিন্তু সম্প্রতি মডেলই খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। মনের মতো মডেল। যে মডেল পেলে আন্তর্জাতিক সমঝদারদেরও টনক নড়বে। অনেকবার অনেক মডেল নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু তেমন মন ওঠে না। শিল্পী নিজে মুগ্ধ না হলে, মুগ্ধ করবে কাকে? মন না ভরলে, গড়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা। এজন্যে টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত সে।

আগের দুদিন যেখানে বসেছিল আজও সেই কোণটাই বেছে নিয়ে বসল। বিয়ারের অর্ডার দিল। এখান থেকেই মেয়েটিকে দেখেছে দুদিন। আজও দেখছে। মুখখানা গত দুদিনের মতোই চেনা-চেনা লাগছে। একজন ফিটফাট শিখ তরুণের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইছে মেয়েটি। আর এক-আধবার ঘাড় ফিরিয়ে ওকেও দেখছে। আগের দিনও দেখেছিল।

গৌতম দত্ত অল্প অল্প বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে, চোখ দুটো তার অদূরের নারীতনুতে আটকে আছে। গত দুদিনের মতোই বিশ্লেষণ করে দেখছেনাক, মুখ, চোখ, ঠোঁটের বক্রাভাস,

চিবুক, গলা। তারপর বক্ষাভাস-মার্জিত চোখে যতটুকু সয় ততটুকুই স্পষ্ট, ততটুকুই সুন্দর। তারপর কটিদেশ। তারপর আরো নীচে, আরো নীচে–একেবারে পা পর্যন্ত।

আজই প্রস্তাব করবে গৌতম দত্ত।

শিখ তরুণটির পানাহারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হাসিমুখে উঠল মেয়েটি। আগের দুদিনও প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করতে দেখেছে। চাহিদা বজায় রাখার এটাই বোধহয় রীতি।

অনেক পুরুষেরই পরিচিতসুলভ ব্যবহার মেয়েটির সঙ্গে। কেউ হেসে অভ্যর্থনা জানায়, কেউ বা অভিবাদনে। মেয়েটি হেসে কারো সামনে দু-পাঁচ মিনিট বসে, কারো সামনে দাঁড়িয়ে দু-চারটে কথা বলে। আবার এগোয়। হোটেল কর্তৃপক্ষ যেন এখানকার মাননীয় অতিথিবর্গের সুখ-সুবিধের ভার তার ওপরেই অর্পণ করেছে। কারো হাসিমুখের আমন্ত্রণ দেখলেই হাসে, কাছে এসে খোঁজখবর করে।

দুটো টেবিলের ওধার দিয়ে যেতে যেতে আবারও দৃষ্টি বিনিময়। গৌতম দত্ত হাসল। যেমন করে ওরা হাসে। তার থেকেও ভালো করে। কাছে আসার অনুরোধের মতো হাসি।

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। হাসি মিলিয়ে আসছিল। সেটা খেয়াল হতেই হাসির জবাব দিল। সুন্দর সুচারু হাসি। তারপর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

-বসুন না।

গৌতম দত্ত শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা জানাল।

বসল। মুখোমুখি গৌতম দত্তও। আবারও মনে হল, মুখখানা চেনা-চেনা।

-আপনাকে কিছু দিতে বলি?

-না না, ধন্যবাদ, আপনি খান। আপনাকে নতুন দেখছি কদিন ধরে, নাকি আগে অন্য সময়ে আসতেন?

-না, এই তিনদিন এলাম।–গৌতম দত্ত থমকালো একটু, তারপর বলে ফেলল – তিনদিনই আপনার জন্যে আসছি।

-খুব ভাগ্য!–মেয়েটি হাসল। কিন্তু মনে হল এ-রকম কথা শুনে সে অভ্যস্ত।

গৌতম দত্ত দ্বিধা জানে না, কাজ বোঝে। হাতে এমন সময়ও নেই যে ভণিতা করে সময় কাটাতে পারে–অনেকের অনেক জোড়া চোখ এই টেবিলে। মেয়েটিও এর মধ্যে ঘড়ি দেখেছে একবার। এই এক হাতের মধ্যে তাকে দেখে গৌতম দত্ত কাজের ফয়সালাটা করে নেবার জন্য ভিতরে ভিতরে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বলল, –আমার একটু বিশেষ আলোচনা ছিল আপনার সঙ্গে, একটা দরকারী প্রোপোজাল, কিন্তু এটা ঠিক সিরিয়াস আলোচনার আবহাওয়া নয়, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, আপনি যদি দয়া করে খানিকক্ষণের জন্যে আমার সঙ্গে আসেন।

এবারে মেয়েটির থমকাবার পালা। টানা টানা চোখ দুটি গৌতম দত্তর চোখের গভীরে। জবাব দিল না চট করে।

গৌতম দত্তর বলার মধ্যে এবারে প্রচ্ছন্ন অনুনয়ের সুর।–আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যি খুব দরকারী আলোচনা, আপনার কোনো ভয় নেই, আমি আবার আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাব।

–না, ভয় আর কি, চলুন।অল্প করে হাসল মেয়েটি।

গৌতম দত্তর মনে হল, এই হাসিটুকুও এঁকে রাখার মতো সুন্দর।

বিয়ারের গ্লাস থাকল পড়ে। গ্লাসে একটা নোট চাপা দিয়ে উৎফুল্ল চাপা আনন্দে সসঙ্গিনী নীচে নেমে এল। মোটরে উঠল। গাড়ি মাঠের ধার দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা ধরে চলল। গৌতম দত্ত কি ভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে নিচ্ছিল...সঙ্গিনী পাশের গদিতে গা ছেড়ে দিয়েছে।

এবারে একটু ভণিতা করা যেতে পারে। গৌতম দত্ত বলল–আচ্ছা আপনাকে যেন কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

অস্ফুট হাসির শব্দ।–বিলিতী ক্যালেন্ডারে দেখে থাকবেন।

কিন্তু কোনো ক্যালেন্ডারে গৌতম দত্ত দেখেছে বলে মনে পড়ল না। দেখলে এ-মুখ মনে থাকার কথা।

মেয়েটি হালকা গাম্ভীর্যে বলল–আপনাকে তো এসব দিকে আনাড়ী মনে হয়, অচেনা কাউকে এভাবে গাড়িতে ডেকে তুলবেন না, বিপদ হতে পারে। কত রকম যে থাকে–

-না, ইয়ে–আমার অন্য কথা ছিল—

–সে তো শুনলাম। নমিদি কেমন আছে? কোথায় বিয়ে হল–ছেলেপুলে কী?

গৌতম দত্ত হতভম্ব।–আপনি নমিকে চেনেন?

-ওমা, চিনব না কেন? কতদিন পাশাপাশি কাটালাম, দিনরাত ঘরে বসে আপনার কত ছবি-আঁকা দেখতাম।

গৌতম দত্তর প্রায় মনে পড়ল বুঝি এবার, বিয়ের কথাও উঠেছিল পাশের বাড়ির কার সঙ্গে যেন–এই নাকি! কি কাণ্ড! হলে তো হয়েছিল আর কি! কিন্তু তার আশাও বাড়ল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল–তোমার–আই মিন্ আপনার নামটি কী?

–নাম মালা–অস্ফুট মিষ্টি হাসি তেমনি–নামে কি চিনবেন, দিনরাত চোখ-কান বন্ধ করে কাজ করতেন আপনি।

প্রশংসার কথাই। গৌতম দত্ত মনে মনে খুশী হল। স্তুতি অনেক জোটে, কিন্তু যার কাছে স্বার্থ তার স্তুতিটা বেশী কাম্য। স্টিয়ারিং হাতে থাকায় ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে দেখার সুবিধে হচ্ছিল না। বলল–তখন নিজের খেয়ালে আঁকতুম, শিল্পী হিসেবে এখন একটু-আধটু চেনে অনেকেই

মালা সায় দিল।–চিনবে জানতুম।–তা দরকারী আলোচনাটা কি আপনার, মডেল চাই?

গৌতম দত্ত অবাকই হচ্ছে মনে মনে। এই চেহারার এমন এক মেয়ে তার বাড়ির গায়ে থাকত, অথচ ভালো করে সে লক্ষ্যও করে নি কোনোদিন।...বছর দশেক হয়ে গেল বোধহয়, বয়েস তো তাহলে আটাশ-উনত্রিশের কম নয়–অথচ এত কাছ থেকেও সে বাইশ-তেইশের বেশি ভাবে নি। কারণ থাক আর না থাক, গৌতম দত্ত এই জন্যেও বোধহয় আরো খুশী মনে মনে। কিন্তু পেশাগত আলোচনার মুখে আগ্রহটা খুব বেশী দেখানো উচিত নয়।

মাথা নাড়ল। বলল–হ্যাঁ, একের পর এক দেখে যাচ্ছি, তুমি–মানে আপনি রাজী হলে

–তুমি আপনিতে বড় গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। একটা ঠিক করুন। তুমিও বলতে পারেন, আপত্তি করব না–

আপত্তি করবে না। সুতরাং তার আসা সার্থক, সেটা গৌতম দত্ত ধরেই নিয়েছে। বলল–তুমি রাজী হলে সেট করে ফেলি।

মালা ভাবনায় পড়ল যেন একটু।–আমার কি সময় হবে

লাগোয়া বাড়ির পড়শিনী ছিল একদিন, সেই কারণে গৌতম দত্তর যেন দাবিই আছে। জোর দিয়ে বলল–এ একটা মস্ত কাজ। আমার অনেক নতুন আইডিয়া আছে, অনেক প্ল্যানও আছে–আমার বিশ্বাস বিদেশেও কম কদর হবে না, আর মডেল হিসেবে তোমারও নাম ছড়াবে–এ রকম যোগাযোগ সব সময় ঠিক হয় না।

– অর্থাৎ যোগাযোগটা মালার দিক থেকেও সৌভাগ্যসূচক। মালাও সেটা বুঝল যেন, বলল–লোভ হচ্ছে। আচ্ছা, এবারে গাড়ি ফেরান, যেতে যেতে, কথা বলি।

গৌতম দত্ত গাড়ি ফেরাল। অন্তর তুষ্টিতে ভরপুর। লোভের আরো একটু ইন্ধন যোগাল। বলল, এক আধ বছরের মধ্যে হয়ত-বাইরেও যাব আমরা

মালা চুপচাপ ভাবল একটু। বলল–আপনার মডেল মানে তো–ক্যালেন্ডার ট্যালেন্ডারে যে রকম সিটিং দিই, সে রকম নয় বোধহয়?

গৌতম দত্ত মাথা নাড়ল।-না সে রকম নয়। রিয়েল মডেল বলতে যা বোঝায়, মানে–

বলাটা সহজ হচ্ছিল না। মালা হেসে থামিয়ে দিল।–থাক, বুঝেছি। আচ্ছা, কি রকম কি ব্যবস্থা হবে বলুন

-তুমি বললেই ভালো হয়, কি রকম দরকার–

দরকার তো কম নয়।-হাসি-হাসি মুখখানা হিসেবে মগ্ন একটু।–তা দিনে কাজ, না রাত্রিতে?

দিনের বেলায়ও দরকার হতে পারে, তবে রাত্রিতেই কাজ করি

হিসেব ভুলে মালা সকৌতুকে ঘাড় ফেরাল তার দিকে।

–রিয়েল মডেল নিয়ে রাত্রিতে কাজ করলে আপনার স্ত্রী রাগ করেন না? বিয়ে করেছেন তো?

কাজের প্রসঙ্গে এই মেয়েলী কথা ভালো লাগল না গৌতম দত্তর। এককথায় দুটো জবাব সারল।–তিনি জানেন এটা পেশা আমার।

মালা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, সেটা ঠিক কথা। জিজ্ঞাসা করল–কতদিনের কাজ আপনার?

–কাজ অনেকদিনের, এক বছরের না হয় তিন বছরেরই কন্ট্রাক্ট করে নিতে রাজী আছি আমি। তারপরেও কাজ শেষ হবে না, কন্ট্রাক্ট আবার রিনিউ হবে।

মালা খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল যেন। মনে মনে আবার একটু হিসেব করে নিয়ে বলল–দিনে কম হলেও দেড়শ টাকা–মাসে ধরুন সাড়ে চার হাজার টাকা রোজগার আমার, বেশীও হয়–

গৌতম দত্ত আঁতকে উঠল একেবারে। গাড়িটা সুষ্ঠু নড়েচড়ে গেল একটু। মনের মতো মডেল পেলে সে মোটা টাকা খরচ করতে প্রস্তুত-সেই মোটা টাকার অঙ্কটা খুব বেশী হলে হাজার টাকা মাসে। এই একটা অঙ্ক শুনে, রাজ্যের হতাশা যেন গ্রাস করতে এল তাকে। নিজেকে খানিকটা বঞ্চিত করে আর পৈতৃক সম্পত্তির জোরে টেনেটুনে বড় জোর দেড় হাজারে উঠতে পারে। সেও এই ঝোঁকে, এই মডেলের জন্যে।– শুকনো মুখে বলল–আমি অত পেরে উঠব,কেন, এতবড় কাজের দিকটা ভেবে আর শিল্পীর দিকটা ভেবেই তুমি যদি অনুগ্রহ করে রাজী হও।

চরম হতাশার মুহূর্তেও একটুখানি আশার আলো দেখছিল কি গৌতম দত্ত? সামনের দিকে নজর রাখা ভুলে পার্শ্ববর্তিনীর দিকেই চাইছে ফিরে ফিরে। আবেদনের ফলে একটু ভাবছেই মনে হল।

মালা বলল–মুশকিলে ফেললেন। আচ্ছা, মোটামুটি ওই চার হাজার পর্যন্ত পারি, তার নীচে আর পারি না।

গৌতম দত্তর সময় লাগল আত্মস্থ হতে। গাড়ি হোটেলের কাছাকাছি এসে গেছে। অস্ফুট স্বরে বলল–না, সেও আমার সাধ্যের বাইরে।

মালা তক্ষুণি সান্ত্বনার সুরে বলল–তাতে কি, কমে কি আর পাওয়া যায় না? আমার সঙ্গেই তো কত সময় কত জনের দেখা হয়, আর তারা সব দেখতেও ভালোই। আপনার স্টুডিও এখনো বাড়িতেই তো? সুবিধেমতো কাউকে পেলে আপনার ঠিকানা দিয়ে দেবখন।

গৌতম দত্ত নিরুত্তর।

গাড়ি হোটেলের সামনে দাঁড়াল। মালা নেমে এসে স্মিতমুখে দুহাত জুড়ে নমস্কার জানাল–বেড়িয়ে বেশ লাগছে, অনেক ধন্যবাদ। চলি।

ফুটপাথ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল গৌতম দত্ত। সিগারেট ধরাল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

হোটেলের সিঁড়ি পর্যন্ত টকটকিয়ে এসে মালা দাঁড়িয়ে পড়ল। দোতলার দিকে তাকাল একবার। আজ আর ইচ্ছে করছে না দোতলায় উঠতে।...চল্লিশ-পঞ্চাশটা টাকা লোকসান কম করে। হোকগে। মনটা ভালো লাগছে খুব। শিথিল চরণে আবার বাইরে এসে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল সে।

.

এই স্পীডে গৌতম দত্ত গাড়ি চালায় না কখনো। ঘণ্টায় বিশ মাইলও হবে কিনা সন্দেহ। তার জীবনেরই খানিকটা গতি কমে গেছে যেন।

অবসাদগ্রস্তের মতো গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিল গৌতম দত্ত, মেয়েদের কি হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই?

বীতশোক

চকিত উত্তেজনা ঘোরালো হয়ে উঠতে পারত। সুবেশা, চোখে ঘোর-লাগানোরমণীর। অপমানে পথ-চলতি খদ্দেরের রোষ আরো লোক টেনে আনতে পারত। জনতার মেজাজ চড়লে ছোট দোকানের ছোট্ট আশা নির্মূল হতে পারত। তবু, কোনো পরিণাম না ভেবেই এই কাণ্ড করে বসল সদানন্দ।

পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে একাগ্র মনোযোগে শৌখিন বেসাতির সামগ্রী সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছিল সে। আট-দশজন ফুটপাথের খদ্দের জিনিস দেখছে, যাচাই বাছাই করছে জেনেও ফিরে তাকায় নি। যেন দোকান গোছানোটাই আপাতত বড় কাজ। এমন কি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এই খদ্দেররা বা উৎসুক দর্শকরা সচেতন ছিল না। হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়ে তারা ওই সতেরো আঠারো বছরের জোয়ান ছেলেটার কাণ্ডকারখানা দেখছিল, আর কটুভাষণ শুনছিল। আর উদগ্র বিস্ময়ে অতি আধুনিকাটির শুকনো বিড়ম্বিত মুখখানি পর্যবেক্ষণ করছিল। মেয়েটার আসল চেহারা বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল তারা।

ফুটপাথ বিপনীর মালিক সদানন্দর দিকে কারো চোখ ছিল না। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই দ্বিতীয় নাটকের জন্যেও কেউ প্রস্তুত ছিল না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সদানন্দ আচমকা গর্জনে ছেলের টুটি কামড়ে ছিঁড়তে এল যেন। কৌতূহলী ক্রেতা আর দর্শকরা আঁতকে উঠল একেবারে। জোয়ান ছেলেটা হতভম্ব। এমন কি,

যাকে কেন্দ্র করে এই পরিস্থিতি, সেই সুবেশা প্রসাধনপটিয়সী তন্বী-সদৃশাটিও বিমূঢ় হঠাৎ।

ছেলেকে যেন ছিঁড়েই ফেলবে সদানন্দ, গর্জে উঠে ছেলের দিকে ঝুঁকতে চেষ্টা করল সে।–চোপ! পাজী বদমাস অভদ্র ইতর কোথাকার, আজ তোকে আমি খুন করব! সরে আয় বলছি এদিকে, লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে পর্যন্ত শেখো নি উল্লুক কোথাকার, সরে যা ওদিকে! নইলে আজ তোকে–

তারপর খদ্দেরের ঘাড়ে পড়ার ভয়েই হয়ত উদ্যত ঘুসিটা নামিয়ে নিল। হতভম্ব ছেলেটাও কুঁকড়ে গিয়ে নিজের অগোচরে কোণের দিক ঘেঁষে বাপের নাগালের বাইরে সরে দাঁড়াল। চুপসে গেলেও তার বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি।

দুহাত জুড়ে সদানন্দ কাকুতি মিনতি করে বলল–অপরাধ নেবেন না মা-লক্ষ্মী, ছেলের বাপের দিকে চেয়ে ওকে ক্ষমা করুন। এই পাঁচ টাকার নোটটা আপনিই দিয়েছিলেন তো... দিয়ে আপনি অন্য জিনিস দেখছিলেন দেখে আমি একটু এদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, ওই পাজীটা না দেখেই...ইয়ে, তাহলে পার্সটার দাম হল গিয়ে দুটাকা বারো আনা, আপনি ফেরত পাবেন গিয়ে দুটাকা চার আনা...

বলতে বলতে তাড়াতাড়ি কাঠের বাক্সটা খুলে একটা দুটাকার নোট আর খুচরো চার আন্ন–পয়সা মেয়েটির হাতে দিয়ে আবার হাত জোড় করল।–দোষ নেবেন না মা লক্ষ্মী, আপনারও খেয়াল ছিল না, আমিও ওদিকে জিনিস সামলাচ্ছিলাম...পাজী ছেলেটার কাণ্ডজ্ঞান নেই, এবারের মতো ক্ষমা করুন।

মা-লক্ষ্মী ক্ষমা করলেও সমবেত উৎসুক দর্শকরা হয়ত অত সহজে ক্ষমা করত, যদি না প্রসাধনবিলাসিনীটি অমন বিমূঢ় চোখে মলিন অথচ কমনীয়দর্শন প্রৌঢ়টির দিকে ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে থেকে ফেরত টাকা ও খুচরো পয়সা ভ্যানিটি ব্যাগে পুরতে পুরতে দ্রুত প্রস্থান করত সেখান থেকে। আর, যদি না ছেলের অপরাধের দরুন অতটাই আন্তরিকতা ফুটে উঠত প্রৌঢ় সদানন্দর মুখে। উৎসুক দর্শকদের মধ্যে দুই-একজন মন্তব্য করতে ছাড়ল না তবু। ছেলেটার দিকে চেয়ে বলল-খদ্দেরের সঙ্গে বিশেষ করে মহিলার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলে মারের চোটে হাড় গোড় গুড়োবে কোন দিন, দোকান করাও বেরিয়ে যাবে।....

আর একজন বলল–মেয়েটা ভালো তাই, নইলে থাপ্পড়ের চোটে দাঁত নড়ে যেত।

ছেলেটি সভয়ে বোবার মতো দাঁড়িয়েই আছে, সদানন্দর দুই হাত তখনো উত্তেজনাপিপাসু সমবেতদের উদ্দেশে যুক্ত। ফলে আর গণ্ডগোলের আশা ছেড়ে তারা একে একে চলে গেল।

রাত বাড়ছে। সাদাটে আলোর ছটায় মহানগরীর অভিজাত যৌবন বাড়ছে। নতুন খদ্দের আসছে, যাচ্ছে। বাঙালীর থেকে অবাঙালীর আনাগোনা বেশী এদিকটায়। যেতে আসতে তারা থমকে দাঁড়াচ্ছে। শৌখিন সিগারেট কেস দেখছে, পার্স দেখছে, ঘড়ির ব্যাণ্ড দেখছে, গগল্স দেখছে। শো-কেসে আর সামনের খোলা কেসে এ-রকম হরেক সখের সামগ্রী সাজানো আছে। এখানে কেনার থেকে দেখার লোকই বেশি। কিন্তু কিছু বিক্রী হলে অন্য জায়গা থেকে চড়া দামেই বিকোয়। কেউ দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ কিছু হাতে নিয়ে পরখ করছে, আর কেউ বা দাম জিজ্ঞাসা করছে। কিনছেও কেউ কেউ। দোকান আপাতত

সদানন্দ একাই চালাচ্ছে। থমথমে মুখ। ছেলের দিকে একবারও তাকায় নি এতক্ষণের মধ্যে।

ছেলে বিষ্ণু ওধারের টুলটায় চুপচাপ বসে আছে সেই থেকে। তার দোকানের দিকে চোখ নেই, কে কি দেখছে বা নিচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য নেই, সে শুধু বাপের দিকেই চেয়ে আছে। ঘুরে ফিরে বাপকেই দেখছে।

বাপের সেই আচমকা গর্জনে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল, তারপর জনতার রাগের ফলাফল ভেবে সে ভয়ও পেয়েছিল। কিন্তু সব সত্ত্বেও কি যেন ভোজবাজীর ব্যাপার ঘটে গেছে একটা। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে দুর্বোধ্য এখনো।

অনেকদিন শিকারীর মতো ওত পেতে থেকে আজ মেয়েটাকে ধরেছিল বিষ্ণু। তার স্থির বিশ্বাস ছিল হাতেনাতেই ধরেছে, গেল বারের মতো এই দিনেও সে দাম না দিয়েই জিনিস ব্যাগে পূরে চলে যাচ্ছে। বাবা অবশ্য বলে, গেল বারেও দাম দিয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুর সন্দেহ যায় নি। গেল বারের সেই দিনে খদ্দেরের ভিড় একটু বেশি ছিল। দু-চারটে চলনসই রকমের সুশ্রী মেয়ে এসে দাঁড়ালেই দু-দশজন পুরুষও এসে দাঁড়ায়, সেটা বিষ্ণু লক্ষ্য করেছে। সেদিনও তাই হয়েছিল। ওই মেয়েটা কলম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। একটা কলম মোটামুটি পছন্দ হয়েছিল। একটু বাদে বিষ্ণু দেখে সেই মেয়েটাও নেই, কলমটাও নেই। বিষ্ণু তপ্তমুখে তক্ষুণি বাপকে বলল–ওই মেয়েটা কলমের দাম দিয়ে গেল না?

সাধারণ স্থলে উল্টে বকুনি খাবার কথা বিষ্ণুর। কিন্তু শোনামাত্র বাবা কেমন যেন। হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল–কোন কলমের দাম?...ও, দিয়েছে বোধ হয়।...হ্যাঁ দিয়েছে।

কিন্তু বিষ্ণুর সংশয় যায় নি। তার ধারণা মেয়েটা অত্যন্ত খারাপ, প্রায়ই তাকে এক একটা লোকের সঙ্গে কেমন ধরনের সাজগোজ করে ঘোরাফেরা করতে দেখে। অত রঙ-করা ঠোঁটের হাসি বিশ্রী দেখায়। দশহাত দূরের ওই যাদুলালের আইসক্রিম সোড়া লিমনেড আর সিগারেটের দোকানে সু-সঙ্গী প্রায়ই রাত নটা দশটার সময়েও দেখা যায় তাকে। দুজনেই সোডা লিমনেড খায়, কিন্তু সঙ্গী কি খায় এক নজর তাকিয়েই বিষ্ণু বুঝতে পারে। যাদুলালের দোকানে শৌখিন অবাঙালী খদ্দেরের ভিড় বেশি কেন, বিষ্ণু তা খুব ভালো করেই জানে। সোডা লিমনেডের বোতলে অন্য মালও রাখে সে। খদ্দের বুঝে বার করে দেয়। ওই রকম লোক যার সঙ্গী, সে আর কেমন মেয়ে হবে? এই বিরূপ ধারণা থেকেই বিষ্ণুর বিশ্বাস, কলমটা খোয়াই গেছে, দাম না দিয়েই মেয়েটা কলম নিয়ে সরে পড়েছে। বাবার খেয়াল নেই, তাই বলছে দাম দিয়ে। গেছে।

আজ আবার সেই মেয়ে যখন মেয়েদের শৌখিন পার্সগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিল –বিষ্ণু তখন থেকেই মনে মনে প্রস্তুত। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাবা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অন্য কাজ করতে লাগল বলে বিষ্ণুর মনোযোগ অত প্রখর। কিন্তু চেয়ে ছিল আর একদিকে, এই শ্যেন প্রতীক্ষা বুঝতে দিতে সে রাজী নয়। তারপর মেয়েটা পা বাড়াবার উপক্রম করতেই এক লাফে উঠে এসে সরাসরি হাত চেপে ধরেছিল। তার।

-দাম না দিয়ে ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছেন যে? দুটাকা বারো আনা দাম ওটার, অমনি নেবার জন্যে নয়–

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার পুরু প্রসাধন-খচিত মুখও বিবর্ণ। বিড়ম্বনার ভাব কাটাতে চেষ্টা করে শুকনো ব্যস্ততায় বলল–দাম দিই নি বুঝি, ভুল হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দাম দেবার জন্যে তার মধ্যে হাত পুরে দিল। কিন্তু শূন্য হাতটাই উঠে এল আবার। এবারের বিস্ময় আরো শুকনো, আরো শঙ্কামিশ্রিত। এই যাঃ, নোটটা...আশ্চর্য, নোটটা তো

-নোটটা হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে। সেদিন আমাদের চার টাকা দামের কলমটাও অমনি খোয়া গেছে আপনার হাতে, ওসব চালাকি রেখে দামটা গুনে দিয়ে। যান–

অন্যান্য খদ্দেররা উৎসুক হয়ে উঠেছিল। আর দু-পাঁচজন দাঁড়িয়েও গিয়েছিল। এরই মধ্যে বাবার ওই আচমকা গর্জন, আর ওই মূর্তি

.

রাত হয়েছে, আর একটু বাদে দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরবে তারা। সদানন্দ এতক্ষণ। বাদে ছেলের দিকে তাকালো হঠাৎ। মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করল–কি রে রাগ। হয়েছে খুব?

বাবাকে আজ বেশ কিছুদিন ধরেই বিমর্ষ, চিন্তাচ্ছন্ন দেখছে সে। ঘণ্টা আড়াই আগে আজ ওই ব্যাপার ঘটে না গেলে তার মুখের নিবিড় বেদনার ছায়াটাই হয়ত বিষ্ণু আগে লক্ষ্য করত। ওধারের টুল থেকে সে বাবার দিকে থমকে চেয়ে রইল একটু, তারপর ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল–মেয়েটা টাকা দিয়েছিল?

সদানন্দ মাথা নাড়ল।...দেয় নি।

কিন্তু এই উত্তরটুকুই যে সব নয়, খেয়াল করল না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল একটু। খানিক বাদে সচকিত হল। ছেলে তেমনি স্থির চোখে দেখছে তাকে। তার মনে পাঁচ রকমের প্রশ্ন উদয় হতে পারে, সেটা খেয়াল হল। এ-রকম একটা মেয়ের জন্য এই দরদ স্বাভাবিক নয়।

একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল তোর একটা বোন ছিল তোর থেকে পাঁচ বছরের বড়। তোর মনে নেই, তোর মাত্র দু বছর বয়েস তখন।...এই মেয়েটাকে দেখার পর থেকে আমার কেবলই মনে হয়, মেয়েটা থাকলে এ রকমটাই হয়ত দেখতে হত...

মা-বাবার মনে কিছু একটা দুর্ঘটনার চাপা ব্যথা আছে, তার আভাস চিৎ কখনো ছেলে পায়। তবে জীবন ধারণের সতেরো ঝাটে থাকে বলে খেয়াল করে না। রাগ বা অভিমান ভুলে বিষ্ণু উদগ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করল–সে কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব বদলালো সদানন্দর। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল-মরে গেছে।

একটু বাদে আবার অন্যমনস্কর মতো বলল—তোর মাকে এ সব বলিস না কিছু, বড় ভালোবাসত, মনে পড়লে খুব মন খারাপ হবে।

বাপের কথা শুনে বিষ্ণু মনে মনে নিশ্চিন্ত হল। বোন ছিল শুনে সে-ই কিনা ভেবে ঘাবড়ে গিয়েছিল। মরা মেয়েকে মনে পড়ার দরুন কতবড় বিপদে ফেলার ব্যবস্থা করছিল ওকে, সে-কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে উষ্ণও হয়ে উঠল একটু। তবু এই নিয়ে আর আঘাত দিতে মন সরল না। বিষ্ণুর সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল ওই মেয়েটার ওপর, যে মেয়েটা দু-দুবার ঠকিয়ে গেল তাদের। সব-জায়গায় এ-ই করে বেড়ায় নিশ্চয়। বাপের অসাক্ষাতে কোনোদিন বাগে পেলে দেখে নেবে। বয়েস হলে। লোকের, জ্ঞানগম্যিও কমে যায় বোধ হয়, চুরি করতে দেখেও কবেকার কোন মরা মেয়ের শোক উথলে ওঠে।

বাপ ছেলে দুজনে ঘরের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে। সামনের রাস্তাটা পার হবার মুখে এক সঙ্গে দুজনারই পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল হঠাৎ।

রাস্তার এক আড়ালে একটা দেয়ালের ধার ঘেঁষে সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। একা। তাদের দেখে দুপ এগিয়েও থমকে দাঁড়াল। বিষ্ণুর মনে হল তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল, বাবার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে একা পেলে কাছে আসত, বলত কিছু।

তার জামাটা ধরে একটা টান দিয়ে রুক্ষস্বরে সদানন্দ বলল—দাঁড়ালি কেন, চল—

হন হন করে রাস্তাটা পার হয়ে গেল সে। দ্রুত পা চালিয়ে তবে বিষ্ণু বাপের নাগাল পেল।

ছেলেকে গোটাগুটি সত্য বলে নি সদানন্দ। মেয়ে সত্যিই মরে গেছে কিনা জানে না। সকলের অগোচরে স্ত্রী অনেক সময় গজগজ করেছে, কতকাল আর ওই পোড়ারমুখির জ্বালা বুকে চেপে বসে থাকবে, আর কতকাল ভাববে?

সদানন্দ কখনো চুপ, কখনো বলেছে–ও মরে গেছে শুনলে আর ভাবতাম না, জ্বালাও জুড়তে....

একটানা ষোলটা বছরের ঘাত-প্রতিঘাত গেছে এই জীবনের ওপর দিয়ে, তবু ক্ষতটা মনে হয় সেদিনের। একেবারে তাজা। সংসারের দুঃখে-দারিদে বরং অনেকটা ভুলেছে, কিন্তু সদানন্দ ভুলতে পারে নি। ছেলের কাছে যাই বল, সাত বছরের সেই দুরন্ত সুশ্রী মেয়েটা আসলে চোখের মণি ছিল তারই।

ওই মেয়েরও আগে ছেলে ছিল আর একটা। তারপর মেয়ে। মেয়ে হওয়ার পর স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভেঙেছিল। পাঁচ বছর বাদে বিষ্ণু এসেছে। আর তার দুবছর যেতে কোলে। আর এক ছেলে এসেছে। এই তিন ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে সেই সচ্ছলতার দিনেও হিমসিম অবস্থা। মোটামুটি লেখাপড়া শিখেছিল সদানন্দ, পদ্মা-পারের একটা ছোট ব্যাঙ্কে কেরানীর চাকরি করত। বেতন সামান্য। তবু ভদ্রঘরের ছেলে সদানন্দ, ভদ্রবংশের সন্তান।

স্ত্রীর এক নিঃসন্তান বড় ভাই থাকত লাহোরে। তাদের তুলনায় বেশ অবস্থাপন্ন। দেশে কিছু হল না দেখে বিদেশে গিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল। খুব ছোট থেকে বড় হয়েছে। সে একবার পদ্মা পেরিয়ে এসে মাস খানেকের জন্য বোনের অতিথি। হল। মামার সঙ্গে

ওই সাত বছরের মেয়ের ভারি ভাব হয়ে গেল। মিষ্টিমুখ মেয়েটা সকলেরই চোখে পড়ত। মামারও মন টানলো। বোনের অবস্থা দেখে নিজেই প্রস্তাব দিল, মেয়েটাকে সে নিয়ে যেতে পারে, মামীর কাছে মানুষ হবে, লেখাপড়া শিখবে। বছরে একবার করে না-হয় বাবা-মায়ের কাছে আসবে। আর তাহলে ভালো বিয়ে-থাও হবে মেয়ের।

স্ত্রী তক্ষুণি মেয়ে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। নিজেদের তো এমনিতেই দিন চলে না। মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লোভ সে কিছুতেই সামলাতে পারল না। তাছাড়া নিঃসন্তান অবস্থাপন্ন বড় ভাইয়ের সঙ্গে এ-রকম একটা যোগাযোগ স্থাপিত হলে আখেরে অনেক দিকে সুবিধে হতে পারে।

কিন্তু সদানন্দ খুঁতখুঁত করেছিল। বড় ছেলেটাকে এমনকি দুবছরের ছেলেটাকে নিতে চাইলেও হয়ত তাতে অত মন খারাপ হত না। কিন্তু স্ত্রীর ভয়েই শেষ পর্যন্ত বাধ সাধতে পারল না সে।

ওরা রওনা হবার দিন সকালেই বাড়ি থেকে পালাল। ফিরে আ তে স্ত্রীও মন খারাপ করে জানালো, যাবার আগে মেয়েটা নাকি হাপুস নয়নে কেঁদেছে আর বাবাকে খুঁজেছে।

এর তিন মাসের মধ্যে মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে বড় ছেলেটা চোখ বুজল। আর ছমাসের মধ্যে সমস্ত দেশের শান্তি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। দেশ বিভাগের ফলে দেশের অগণিত মানুষের হৃৎপিণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সমস্ত পরিবারটিকে টেনে হিঁচড়ে সদানন্দ যখন কলকাতায় এনে ফেলল, তখনো যেন বিকারের ঘোর কাটে নি। তখনো মনে হয়েছে কিছু একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে, এই নাড়ীছেঁড়া দুর্বিপাকের সবটাই সত্যি নয়।

স্নায়ুগুলো বশে আনতে অনেক সময় লেগেছে। এর ওপর জীবনধারণের রসদের চিন্তা করতে হয়েছে। আর, এরই মধ্যে এক একটা খবর কানে এসেছে। শুধু পূর্ববঙ্গে নয় অনেক জায়গাতেই মরণযজ্ঞের নরকোৎসব হয়ে গেছে। পাঞ্জাবে-লাহোরেও হয়েছে।

সম্বন্ধীর কাছে একে একে অনেকগুলো চিঠি লিখেছে সে, অনেক ভাবে খবর নিতেও চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা যেন দুনিয়া থেকেই মুছে গেছে। একটানা সোল বছরে তাদের একটা খবরও পায় নি।

.

দোকানের ওই অভিজাত এলাকায় মেয়েটাকে সে বিষ্ণুর আগেই দেখেছিল। মেয়ের সাত বছর বয়েসের সঙ্গে আরো ষোলটা বছর যোগ করে তাকে চেনার কথা নয়। সদানন্দ চেনে নি। এমন কি প্রথম দর্শনে বাঙালী মেয়ে বলেই মনে হয় নি তার। তাছাড়া, অবাঙালী সঙ্গীর সঙ্গেই ঘোরাফেরা করতে দেখছে তাকে। কিন্তু ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দ চমকে উঠেছিল কেন? পদ্মাপারের সাত বছরের একটা মেয়ের। স্মৃতি বুকের তলায় আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল কেন?

আশ্চর্য! সদানন্দ জানে না কেন।

এখনো একটুও নিঃসংশয় নয়, হয়ত একটা উদ্ভট কল্পনা নিয়েই আছে সে। তবু মোহগ্রস্তের মতো নিজের অগোচরে ওই মেয়ের অনুসরণ করেছে, তার পিছু পিছু ঘুরেছে; ওর অসুন্দর জীবনযাত্রার চিত্রটি কল্পনা করে এক অস্বাভাবিক বেদনায় শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। তারপর কতবার সঙ্গীর সঙ্গে ওই মেয়ে পাশের সোডা-লিমনেডের দোকানে

এসে দাঁড়িয়েছে, তার এখানেও এসেছে, দাম না দিয়ে কলম নিয়ে চলে গেছে, আর মানিব্যাগ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। নিজের সঙ্গে অনেক যুঝেছে সদানন্দ, যুঝেছে আর ভাবতে চেষ্টা করেছে, সবই তার আজগুবী কল্পনা, নিছক মিথ্যে।

দুপুরের মধ্যে মেয়েটা অনেকবার দোকানের পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করে গেল। আজ আর অত প্রসাধন নেই। মুখে চোখ-তাতানো সাজসজ্জা নেই। কি এক অমোঘ আকর্ষণেই মেয়েটা যেন বার বার এই ফুটপাথ দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। আর, প্রতিবারই খুব ভালো করে লক্ষ্য করছে সদানন্দকে। কিন্তু ভরসা করে কাছে আসছে। না, আসতে পারছে না।

সদানন্দ সমস্ত মুখ থমথমে গম্ভীর। তার গালের একটা দিক ওই মেয়েটার দৃষ্টির ঘায়ে কটকট করে উঠছে–যেখানে পুরনো পোড়ার বড় ক্ষতচিহ্ন রয়েছে একটা। সাত বছরের মেয়ে সারি করে বাপের তামাকের জ্বলন্ত কলকেয় ফুঁ দিতে নিয়ে এসেছিল। সদানন্দ শুয়েছিল তখন। গরম সামলাতে না পারার দরুন সেই আগুনসুদ্ধ কলকে বাপের গালের ওপর পড়েছিল। একটা মস্ত অঘটনই ঘটে যেতে পারত। মা মেয়েটাকে মেরে একেবারে আধমরা করেছিল সেদিন।

ছেলে বিষ্ণু সকাল থেকে বারকতক মেয়েটাকে লক্ষ্য করেছে, আর আড়ে আড়ে বাপকে দেখছে। আজও মেয়েটার ওপর মনে মনে জ্বলছে সে।

দুপুরে সদানন্দ উঠে বড় রাস্তার ওধারের পুকুরটার দিকে চলল। রোজই দুপুরে সেখানে গিয়ে গাছের ছায়ায় খানিক বসে জিরোয়। মাছ-ধরা দেখে, কখনো বা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

বাধা পড়ল। মেয়েটা আজও যেন তার প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। এখনো খায়। নি বোধ হয়। মুখ শুকনো। কিন্তু শুকনো মুখেও কি এক আশার তাড়না স্পষ্ট যেন। সদানন্দ দাঁড়িয়ে গেল, পায়ে পায়ে মেয়েটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

সামনে এসে দ্বিধা কাটিয়ে মেয়েটা বলল–আপনি কাল আমাকে বাঁচালেন কেন? আমি তো সত্যি পার্সটা চুরি করেছিলাম...।

সদানন্দর জানা দরকার, সদানন্দর বোঝা দরকার কতখানি উদ্ভট কল্পনায় ডুবে আছে সে। মেয়েটাকে খুব ভালো করেই দেখল। দেখে আঁতকে উঠল। ঘষা মোছা প্রসাধনের আড়ালে যেন এক আর্তনারী সম্বল খুঁজছে–আশ্বাস চাইছে। মুখে বলল–আমার একটা ছোট মেয়ে ছিল, মনে হয়েছে, বড় হলে সে তোমার মতোই হত–এই জন্যে।

মেয়েটার দুই চোখে শুকনো মুখে আগ্রহের আলো জ্বলে উঠল যেন। গালের ক্ষতচিহ্নটার দিকে চেয়ে কি এক বিস্মৃতির পরদা আকুল আগ্রহে ছিঁড়েখুঁড়ে সরাতে চেষ্টা করছে সে। জিজ্ঞাসা করল–মেয়েটা কোথায়? হারিয়ে গেছে?

সদানন্দর না জানলেই নয়, সংশয় না, ঘুচলেই নয়। মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, তাই।

–কোথায় ছিল সে? কোথা থেকে হারিয়েছে?

সদানন্দর মনে হল, এমন মর্মছেঁড়া আকুতি সে আর দেখে নি। মনে হল, জীবনের সব সম্বল, সব আশা খুইয়ে এক মুমূর্ষ নারী যেন শেষ আশায় দুহাত বাড়িয়ে তাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে। সদানন্দ-নীরব। দেখছে।

–কি নাম ছিল তার? তার নাম কি...তার নাম কি...

আবার কি যেন স্মরণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় চোখমুখ কুঁচকে গেল তার। তারপরেই উদ্ভাসিত হঠাৎ–তার নাম কি ঝুমুর?

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সদানন্দ। আত্মস্থ হল। দিশা ফিরল। কঠিন বাস্তবের ওপর দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত মুখে মাথা নাড়ল। নাম ঝুমুর ছিল না। ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলল–তুমি এ-রকম করছ কেন? আমার মেয়ে তো মরে গেছে–অনেক কাল আগেই মরে গেছে, বুঝলে?

মুহূর্তের মধ্যে সব আশা আর সব আগ্রহের অবসান হয়ে গেল। নিঃসাড় বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে মেয়েটা চেয়ে আছে তার দিকে। সদানন্দ আর অপেক্ষা করল না। কোথায় যাচ্ছিল ভুলে গেছে। দোকানেই ফিরে এল আবার।

তারপরেও মেয়েটা বার কয়েক এখান দিয়ে যাতায়াত করেছে। খুব সচেতন ভাবে নয়। চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তাও আত্মবিস্মৃতের মতোই। তার যেন এখনো কিছু বুঝতে বাকি, জানতে বাকি।

.

রাত্রি।

আর একটু বাদেই দোকান গুটোবে তারা। বিষ্ণু সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল, কারণ দোকান বলতে গেলে আজ একাই চালাতে হয়েছে তাকে। এই ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকেও বাবার মুখের দিকে চেয়ে কেমন শঙ্কা বোধ করেছে। বাবার এমন অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য আর যেন দেখে নি সে।

হঠাৎ রাস্তার ওধারে অদূরের পুকুরটার দিকে একটা গণ্ডগোল উঠল। লোকজন দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করতে লাগল। বড় রকমের উত্তেজনার কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে ওইখানটায়। ভিড় বাড়ছে, পুলিশও দৌড়চ্ছে দেখা গেল।

বিষ্ণুও ছুটল কি ব্যাপার দেখতে। বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে ফিরে এল আবার। দুচোখ কপালে তুলে বলল–বাবা, সেই বদমায়েস ইয়ে, সেই মেয়েটা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, তার লাশ তোলা হয়েছে দেখে এলাম–

– আরো কি বলতে গিয়ে বিষ্ণু বাপের মুখের দিকে চেয়ে থমকে গেল হঠাৎ।

সদানন্দ অন্যদিকে চোখ রেখে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে।

মন পবনের নাও

নিকুঞ্জবিহারীবাবুর একটা গল্প ছাপা হয়েছে। সেও কোনো হেঁজিপেজি কাগজে নয়। দস্তুরমতো নামজাদা এক সাপ্তাহিক-পত্রে। অদূরে ঘাড় গোঁজ করে তার স্ত্রীটি বসে আছে। নিকুঞ্জবিহারীবাবু সেইদিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন। লজ্জায় সঙ্কোচে আনন্দে বিড়ম্বনায় স্ত্রী সুধারাণী মাটির সঙ্গে মিশতে পারলে বাঁচে।

এখন পর্যন্ত সুধারাণীর সঙ্গে নিকুঞ্জবিহারীর একটি কথাও হয় নি। গত দশ-বারো দিন দুজনার কথাবার্তা বন্ধ। তার আগে বড় মর্মান্তিক কথা বলেছিলেন নিকুঞ্জবিহারীবাবু। বলেছিলেন–তোমার জন্য হয় আমাকে পাগল হতে হবে, নয়তো জঙ্গলে পালাতে হবে। আর এতই যদি অযোগ্য ভাবো, তাহলে কোর্টে ডাইভোর্সের জন্য দরখাস্ত করে দাও।

কথাগুলো শেলের মতো বিধেছিল সুধারাণীর। নয় বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে এরকম শক্ত কথা আর কখনো বলেন নি নিকুঞ্জবিহারীবাবু।

এই কথার পরে কথাবার্তা বন্ধ।

সুধারাণীর বয়েস এখন আঠাশ। ছেলেবেলায় সকলেই তাকে বেশ সুশ্রী বলত। এখনো বলে। একটা মাত্র ছেলে। স্বাস্থ্যের বাঁধুনি এখনও ঢিলে হয় নি। ঢলঢলে কাঁচাভাবটুকু এখনো আছে। এরই দাক্ষিণ্যে একটা লোকের ওপর সুধারাণীর অনেক আধিপত্য খাটে বলেই বিশ্বাস। এবং দিনকে দিন তার এই আধিপত্য বাড়ছিল।

ব্যাপারটা আরো অনেক আগে থেকে বলা দরকার। সুধারাণীর বয়েস যখন এগারো বারো, তখন থেকে। তখন থেকেই পোড়ারমুখি ইন্দিরা তার শত্রু।

খুব সাদামাটা বুদ্ধির মেয়ে ছিল সুধারাণী। কোনো প্যাঁচ-ঘোঁচ বুঝত না। উঠতে বসতে বাড়ির লোক বোকা বলত তাকে। এই খেদে ইস্কুলে তার, চালাক হবার একটু চেষ্টা ছিল। বিশেষ করে ইন্দিরার কাছে। ইন্দিরার রূপ কোনাদিন তার থেকে বেশী ছিল বলে সে মনে করে না। কিন্তু চাল-চলন আচার-আচরণে সবাই সেরা রূপসী ভাবত, তাকে। এমনকি সুধারাণী নিজেও তাই ভাবত। ওই বয়সেই ইন্দিরা অনেক জানত, অনেক বুঝত, অনেক বিচিত্র কথা বলত, আর অনেক রকম ভু ভঙ্গিতে, হাসতে পারত। মোট কথা সুধারাণীর ভিতরে ভিতরে তখন থেকেই একটা ইন্দিরা-কমপ্লেক্স দানা পাকিয়ে উঠেছিল।

ওই বয়সেই কি জব্দই না হয়েছিল একবার ইন্দিরার কাছে। মনে পড়লে এখনো। লজ্জা পায় সুধারাণী। ইন্দিরা তখন থেকেই ছেলেদের আচার-আচরণ কিছুটা বুঝতে শিখেছিল। আভাসে ঠারেঠোরে অনেক কথা বলত সে। এমনি একটা প্রসঙ্গে চুপিচুপি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল–সত্যি করে বল তো, তুই কারো প্রেমে পড়েছিস?

শুনে সুধারাণী বাইরে ইন্দিরার মতোই মুখ টিপে হেসেছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আসলে প্রেমে-পড়া ব্যাপারটা ঠিক যে কি, ভালো করে জানে না। অথচ প্রশ্নের ধরন-ধারণ কেমন যেন নিগূঢ়। প্রেম বলতে বাড়িতে মাস্টার মশাইয়ের কাছে ভগবানের বিশ্বপ্রেম সম্পর্কে ছোটদের একটা কবিতা। পড়েছিল সে-

মাস্টারমশাই বুঝিয়েছিলেন, ভগবান এত বড় যে অতি ছোট অতি ক্ষুদ্রকেও তিনি অবহেলা করেন না।

কিন্তু ভাববার সময় নেই, ইন্দিরা জবাবের প্রতীক্ষা করছে। সুধারাণী সমঝদারের মতো তক্ষুণি মুচকি হেসে মাথা নেড়েছিল।

–কার সঙ্গে রে? কার সঙ্গে? বল না! আমি কাউকে বলব না।-ইন্দিরার উৎসুক চাপা আগ্রহ দেখে ভিতরে ভিতরে সুধারাণী ফাঁপরে পড়েছিল। কাউকে বলবে কি বলবে না এই সংশয়ের ফাঁকে সে একটু ভেবে নেবার সুযোগ পেয়েছিল। প্রেমে পড়তে হলে দ্বিতীয় একজন লোক দরকার, আর যতদূর মনে হয় পুরুষমানুষই হওয়া দরকার। আর, সেই পুরুষমানুষ খুব বড় কেউ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

-মাস্টার মশাইয়ের

শোনামাত্র ইন্দিরা একেবারে হাঁ। সুধারাণীর মাস্টার মশাইকে ইন্দিরাও জানে। ওদের বয়েস বারো, আর তিনি বাষট্টি।

সুধারাণীর কল্পনায় ভগবানের পরেই মাস্টার মশাই বড়। কিন্তু ইন্দিরার চোখমুখ দেখেই মনে হল তার জবাবটা বেখাপ্পা গোছের হয়েছে। তাই আরো জোর দিয়ে বলল–মাস্টার মশাই যে কত বড়, তুই ভালো করে জানিস না

–সে কী রে! একটা বুড়ে-হাবড়া, তুই ফাজলামো কচ্ছিস

ইন্দিরার কি মনে পড়ে গিয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো করে বলেছিল –কেন শিব ঠাকুরও তো বুড়ো-হাবড়া, নামেরও মিল আছে–শিবশঙ্কর। ৬২৬

ইন্দিরা পেটে হাত চেপে হাসার উপক্রম করতেই সুধারাণী বুঝেছিল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি ইন্দিরার একটু আগের সংশয়োক্তি, আঁকড়ে ধরল।

-আচ্ছা বোকা তুই, ঠাট্টাও বুঝিস না!

সেই ইন্দিরা কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়তে কলেজের থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের ছেলেগুলোরও মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সুধারাণী তখন নিঃসন্দেহ, রূপ ইন্দিরার থেকে তার কম নয়। কিন্তু ইন্দিরার চটকের কাছে কলেজের সব মেয়েই। প্রায় নিষ্প্রভ।

ওই সময়েই সুধারাণীকে একটা রোগে ধরল। ইন্দিরা তখন এক উঠতি তরুণ লেখকের প্রেমে পড়েছে। যার গল্প-উপন্যাস তারা ছাপার অক্ষরে পড়েছে। অনেক বড় বড় কাগজ যার লেখার সমালোচনা করছে, টাকা-টিপ্পনী কাটছে। যে তরুণ লেখককে একবার চোখের দেখা দেখতে পেলেও চক্ষু সার্থক হত, রক্ত-মাংসের সেই মানুষটারই কিনা প্রেমে পড়েছে ইন্দিরা! তার সঙ্গে বেড়ায়, সিনেমা দেখে, তার লেখা চিঠি ওদের দেখায়। সেই সব চিঠিও এক একটা জীবন্ত কাব্যের মতো। ভাগ্য আর কাকে বলে!

সুধারাণীর তখন মনে হত, প্রেমিক লেখক না হলে জীবনই বৃথা। যে দু-চারজন ছেলে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার আগ্রহে তার আশে-পাশে ঘুরঘুর করত, সুধারাণী তাদের। প্রতি কঠিন হয়ে উঠল। ওদের একটাও না লেখক, না কবি। রেস্টুরেন্টে বসে শুধু চপ-

কাটলেট সাবড়াতে ওস্তাদ সব! তখন থেকেই এক তরুণ লিপি-যাদুকরের মূর্তি। মনের তলায় লালন করতে লাগল সে।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়ির লোকেরা যেন ষড়যন্ত্র করেই একজনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ। পাকা করে ফেলল তার। মা বাবা খুশী, ভালো জামাই সংগ্রহ করেছেন তারা। বর। কোন এক বড় সাহেবের পি-এ। ভালো মাইনে। কিন্তু ভাবী বরের নাম শুনেই দুই চক্ষু কপালে উঠল সুধারাণীর–নিকুঞ্জবিহারী! কোথায় ইন্দিরার মৃণাল বসু, আর কোথায় তার নিকুঞ্জবিহারী। শুধু এই নামের ধাক্কা সামলাতেই দিন কয়েক সময় লাগল সুধারাণীর। তারপর যুক্তি দিয়ে আশার আলো টানতে চেষ্টা করল সে। বড় বড় স্মরণীয় লেখক বা কবিদের নাম মনে করতে চেষ্টা করল-বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, প্যারীচাঁদ, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর–নাম হিসেবে এগুলো এমন কি মিষ্টি নাম! অথচ এখন তো মনে হয় শুধু ওই নামেই মানায় ওঁদের। আসলে নাম কিছু নয়, গুণই সব। পি-এ যখন–সমস্ত দিন লেখালেখিই করতে হয়। লেখার অভ্যাস থাকলে গল্প-কবিতাই বা লিখতে পারবে না কেন?

সুতরাং বিয়ে হয়ে গেল। প্রথম দর্শনে স্বামীটিকে মোটামুটি মন্দ পছন্দ হল না সুধারাণীর। বেশ চোখা সপ্রতিভ চেহারা। বাসরের প্রথম সঙ্কোচ কাটতে সুধারাণী ঈষৎ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, তুমি লেখো?

নিকুঞ্জবিহারী অবাক।–না তো, কি লিখব?

-এই গল্প, কবিতা–যা হোক?

নিকুঞ্জবিহারী চালাক মানুষ। বাসরে স্ত্রীকে নিরাশ করতে মন সরল না। বললেন –এক কালে কলেজে থাকতে লিখতাম-টিকতাম, এখন আর অভ্যেস নেই–কেন। তোমার বুঝি ওসব খুব ভালো লাগে?

-খু-উব। অভ্যেস করলেই আবার লিখতে পারবে, তাছাড়া অফিসে তো কত কি লিখতেই হয় তোমাকে। একেবারে অভ্যেস নেই বলতে পারো না। কলেজের ম্যাগাজিনে তোমার লেখা ছাপা হত?

নিরুপায় নিকুঞ্জবিহারীকে মাথা নাড়তে হয়।-হত।

সুধারাণীর মুখে খুশী ধরে না।

পি-এর চাকরির দরুনই হোক, বা যে জন্যেই হোক, লোককে খুশী রাখার চেষ্টাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে নিকুঞ্জবিহারীর। এরপর দিনে দিনে স্ত্রীর স্বপ্নের দিকটা চিন্তা করেই অফিসে বা রাতের নিরিবিলিতে একটু আধটু লিখতে চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রথমে কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলেন। তারপর গল্প। তারপর প্রবন্ধ। সবই স্ত্রীকে দেখিয়েছেন। আর সুধারাণীর সবই অদ্ভুত ভালো লেগেছে। স্বামীকে না বলেই সেই সব লেখা সে ডাকটিকিট দিয়ে একে একে মাসিকে সাপ্তাহিকে পাঠিয়ে দিয়েছে– দিয়ে দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করেছে। বলা বাহুল্য সে-সব লেখাই আবার একে একে তার কাছে ফেরত এসেছে।

মান বাঁচাবার জন্য নিকুঞ্জবিহারী বলেছেন–এটা কোটারীর যুগ, দলে না মিশলে বা পেছনে লোক না থাকলে, না পড়েই মাসিক সাপ্তাহিকের সম্পাদকরা তা ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন।

সুধারাণী বিশ্বাস করেছে আর সেই সব অদেখা সম্পাদকদের ওপর মনে মনে জ্বলেছে।

এই করেই একে একে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। কিন্তু সুধারাণী এখনও আশা ছাড়ে নি। আর সেই আশার তাগিদে এখনো মাঝে-সাজে নিকুঞ্জবিহারীকে কিছু না কিছু লিখতে হয়।

সুধারাণী যে এখনো আশা ছাড়তে পারে নি, তার একটা বিশেষ কারণ আছে। ইন্দিরার সঙ্গে এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। সেই লেখকের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছে। তাই দেখা হলে লেখার প্রসঙ্গ ওঠেই। বিয়ের পর অনেকদিন বাদে যখন প্রথম দেখা হয়, সুধারাণী তখনই তাকে ফিসফিস করে বলেছিল–এরও লেখার রোগ আছে রে!

ইন্দিরা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল তাই নাকি, কোন কোন কাগজে লেখেন, নাম-টাম দেখি না

ঢোক গিলে সুধারাণীকে বলতে হয়েছিল-সে-কথা আর বলিস না, আমি ছেড়ে বন্ধুবান্ধবরাও বলে, অত সুন্দর লেখা ছাপাও না কেন? তা ওর এক কথা, লেখার আনন্দের জন্যেই লিখি, ছেপে কি হবে

সুধারাণীর ধারণা, ইন্দিরা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অবিশ্বাস করেছে এবং ঠোঁট বাঁকিয়েছে। অতএব স্বামীকে লেখক বানাবার ঝোঁক সুধারাণীর এখনো কাটে নি।

স্ত্রীর এত আগ্রহ দেখে তলায় তলায় স্বামীরও বাসনা, দুই একটা লেখা অন্তত ছাপা হোক, মান-মর্যাদা বাঁচুক। তাছাড়া একটা লেখা ছাপা হয়ে গেলে স্ত্রীর কাছ থেকে যে উষ্ণ সমাদর লাভ হবে, তাও লোভনীয়।

চেষ্টা-চরিত্র করে একটা খবরের কাগজের রবিবাসরীয় সাহিত্যপত্রে শেষ পর্যন্ত একটা লেখা অনুমোদন করিয়ে ছাড়লেন তিনি। শুক্রবারের কাগজে রবিবারের লেখক সূচীর চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন বেরোয়। সেই বিজ্ঞাপনে নিকুঞ্জবিহারীর নাম বেরুলো– রবিবারে তার অমুক নামে একটা সারগর্ভ রচনা থাকবে।

সুধারাণীর এতকালের আশা সফল। বাড়িতে সেই রাতে যেন নন্দনকাননের বাতাস বইল।

কিন্তু রবিবার হতেই মুখ একেবারে আমসি সুধারাণীর। লেখাটা বেরোয় নি। সম্পাদক লিখেছেন–যান্ত্রিক গোলযোগ বশতঃ নির্ধারিত সব লেখা এ সপ্তাহে প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

স্ত্রীর মুখ দেখেই বেশী রকম আঘাত পেলেন নিকুঞ্জবিহারীবাবু। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিছু একটা কারণে এবারে আটকে গেছে, লেখা মনোনীত হয়েছে। যখন সামনের বারে নিশ্চয় বেরুবে।

কিন্তু শুনে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হল না সুধারাণী। তার সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু। একসময় সচকিত হয়ে দ্রুত উঠে চলে গেল সে।

সোম মঙ্গল দুটো দিন কাজের চাপে অবকাশ মেলে নি নিকুঞ্জবিহারীর। বুধবার স্ত্রীর এই কদিনের শুকনো মূর্তি স্মরণ করেই উক্ত কাগজের সাহিত্য-সম্পাদকের দপ্তরে হানা দিলেন তিনি, লেখাটা আগামী সপ্তাহে বেরুচ্ছে কি না, সেই খবর নিতে।

গম্ভীর মুখে সম্পাদক বললেন–ভেবেছিলাম বেরুবে। কিন্তু বেরুবে না, আপনার লেখা ফেরত নিয়ে যান।

নিকুঞ্জবিহারী বিমূঢ়।-কেন?

সম্পাদক তিনখানা পোস্টকার্ড তার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। বললেন আপনার লেখা না বেরুতেই সেই লেখা সম্পর্কে পাঠকের কাছ থেকে তিনখানা প্রশংসাপত্র এসেছে-লেখা ছাপা হলে কি কাণ্ড হবে ঠিক কি!

হতভম্ব নিকুঞ্জবিহারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে এলেন শেষ পর্যন্ত। ট্রামে বাড়ি ফেরার অবকাশে মাথা কিছুটা সাফ হল।

প্রথমেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি কি করেছ?

সুধারাণী ঢোক গিলে অস্ফুট জবাব দিল।–কেন, আমি তো আবার তাদের চিঠি লিখে বারণ করে দিয়েছি।

তার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিকুঞ্জবিহারী ঘরে চলে গেলেন।

সুধারাণী বুঝল যে ভয় করেছিল, তাই ঘটে গেছে। শুক্রবারের বিজ্ঞাপন দেখেই খুব অন্তরঙ্গ আত্মীয়-পরিজনদের পাঁচ-ছজনকে টেলিফোন করেছিল সে, আর কলকাতার বাইরে পাঁচ-ছখানা চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, তারা যেন রবিবার পেরুলেই অমুক কাগজে অমুক লেখার বিশেষ প্রশংসা করে সম্পাদককে চিঠি দেয়। বাইরে সেই কাগজ যদি নাও পায়, তাহলেও যেন চিঠি অবশ্যই সম্পাদককে পাঠায়–বিশেষ কারণ আছে পরে জানাবে।

এইভাবেই স্বামীর লেখার প্রতি সম্পাদকের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল সুধারাণী। তাই রবিবারে সেই লেখা না বেরুতে মাথায় বাজ পড়েছিল তার। টেলিফোন যাদের করেছিল তাদের আবার টেলিফোনে নিষেধ করেছে। আর চিঠি যাদের লিখেছিল, মরিয়া হয়ে তাদেরও আবার নিষেধ করে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু বিভ্রাট যা হবার তা হয়েই গেছে।

সুধারাণী যেন আসামী। একটু ঠাণ্ডা মাথায় নিকুঞ্জবিহারী প্রশ্ন করে করে সব বার করে নিলেন। তারপর রাগের মাথায় ওই কথা বললেন। বললেন–তোমার জন্যে হয় আমাকে পাগল হতে হবে, নয়তো জঙ্গলে পালাতে হবে। এতই যদি অযোগ্য ভাবো, তাহলে কোর্টে ডাইভোর্সের জন্য দরখাস্ত করে দাও।

সুধারাণী দাতে করে ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলাতে চেষ্টা করেছে। তারপর থেকে এই দশ-বারোদিন বাক্যালাপ বন্ধ।

.

কিন্তু নিকুঞ্জবিহারীর মাথা সত্যিই ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা মাথায় স্ত্রীর অগোচরে একটা গল্প লিখলেন তিনি। স্ত্রীর স্বপ্ন থেকে শুরু করে লেখা ছাপানোর এই বিভ্রাটের গল্প। লিখে এক নামী সাপ্তাহিকের সম্পাদকের হাতে দিয়ে এলেন।

গল্পটা সম্পাদকের এত পছন্দ হয়ে যাবে নিকুঞ্জবিহারীবাবুও আশা করেন নি। পরের সপ্তাহেই সেটা ছাপা হয়ে গেল এবং ডাকে কাগজ এল।

আড়াল থেকে স্ত্রীকে রুদ্ধশ্বাসে সেই লেখা পড়তে দেখেছেন তিনি। পড়া হতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিকুঞ্জবিহারীবাবু তার দিকে চেয়ে হাসছেন মিটিমিটি।

আর, লজ্জায় সঙ্কোচে আনন্দে বিড়ম্বনায় সুধারাণী মাটির সঙ্গে মিশতে পারলে বাঁচে।

মহাবিহার

বিদায় অনুষ্ঠানেও শীলাবতীর অভ্যস্ত সংযম আর গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম দেখল না কেউ। মেয়েরা তাকে ভক্তি করত এবং ভয় করত। শিক্ষয়িত্রীরা তাকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভয় করতেন। এই চিরাচরিত ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় কাটিয়ে শেষ বিদায়ের দিনেও কারো পক্ষে তার খুব কাছে আসা হল না যেন। সকলের কাছে থেকেও শীলাবতী যেমন দূরে ছিলেন, তেমনি দূরেই থেকে গেলেন।?

অল্প দু-চার কথায় স্কুলের উন্নতি কামনা করে সকলকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। জানিয়ে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন শীলাবতী। তাঁর বয়স চুয়ান্ন। সরকারি বিধি অনুযায়ী আরো একবছর স্বচ্ছন্দে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে বহাল থাকতে পারতেন। সরকারি চাকরির মেয়াদ আরো তিন বছর, অর্থাৎ আটান্ন পর্যন্ত টানার জল্পনা-কল্পনা। চলছে, এই একবছরের মধ্যে সেই নির্দেশও হয়ত এসে যেত। মোটমাট আরো চারটে বছর অনায়াসে স্কুলের সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারতেন শীলাবতী। এই দীর্ঘকাল ধরে যেমন ছিলেন।

কিন্তু স্বেচ্ছায়, বলতে গেলে, তদবির তদারক করেই অবসর গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁর স্বাস্থ্য টিকছে না। স্কুলের এতবড় দায়িত্বভার বহন করতে তিনি অক্ষম।

এই বয়সেও তাঁর শরীরের বাঁধুনি দেখলে স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে কেউ বলবে না। চুয়ান্নকে অনায়াসে চুয়াল্লিশ বলে চালানো যায়। অবশ্য, তাঁর হার্টের রোগ, বাইরে থেকে তাই অসুস্থতার ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায় না। আর রাতে যে ভালো ঘুম। হয় না, সেটা বাড়ির দুই একজন পরিচারিকা ভিন্ন আর কেউ টের পায় না। স্কুলে। যখন আসেন, তার ধীর-শান্ত গাম্ভীর্যের আড়ালে সব ক্লান্তি ঢাকা পড়ে যায়।

শুভার্থীজনেরা পরামর্শ দিতে এসেছিলেন, একেবারে অবসর নেবার দরকার কি, লম্বা ছুটি নিয়ে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে গেলেই তো হয়, এক বরাদ্দ ছুটি ছাড়া আর কখনো কোনো ছুটিই তো শীলাবতী নেননি।

শীলাবতী মাথা নেড়েছেন। জীবনভোর তো শুধু চাকরিই করলেন। চাকরি আর নয়। এবারে বাধা-বন্ধনশূন্য ছুটি!

যে-মহিলা আজীবন বিরামশূন্য কর্তব্যের মধ্যে ডুবে রইলেন, আত্মীয় পরিজনবিহীন এই ছুটি তার ক্ষতি করবে বলেই অনেকের ধারণা। সময় কাটবে কি করে, আদর্শপ্রাণা। মহিলা কি নিয়ে থাকবেন এর পরে?

কিন্তু বিদায় নেবার পরমুহূর্ত থেকে কেউ তাকে দেখলে অবাক হতেন। টাঙ্গা। করে একা বাড়ি ফিরছেন তিনি। সামনের আসনে বিদায়ী মালার বোঝা। শীলাবতী আপন মনে হাসছেন মৃদু মৃদু। কে তাঁকে কটা দিন হাসতে দেখেছে আপন মনে? ভালো লাগছে, হালকা লাগছে। চাকরি জীবনের সব আকর্ষণ, কর্তৃত্বের মোহ, কর্তব্যের শেকল–সব ওই কণ্ঠচ্যুত মালাগুলোর মতো জীবন থেকে খসে গেছে। এই মায়া। কাটানোর জন্যে

দীর্ঘকাল ধরে অনেক যুঝতে হয়েছে তাকে, অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। ওরা জানে না, জীবনে এই প্রথম সুখের মুখ দেখতে চলেছেন শীলাবতী।

দেখতে দেখতে এই দিনটা কাটবে। এক ঘুমে এই রাত কাটবে। সকালের ট্রেন ধরবেন তিনি। তারপর দেড়শ মাইল পথ ফুরোতে আর কতক্ষণ? শীলাবতীর আনন্দে ভরপুর চোখের সামনে দেড়শ মাইল দূরের সেই শান্ত স্নিগ্ধ মহাবিহারের পরিবেশটি ভেসে উঠল। বুদ্ধ তথাগতের চরণস্পর্শে সোনা হয়ে আছে যেখানকার মাটি, যেখানকার বাতাসে মিশে আছে তার সম্বোধিবাণী, যেখানকার ধূলিমাটিতে, স্তূপে, তপোবনে, সংগ্রহশালায় ছড়িয়ে আছে তার প্রব্রজিত মহিমার কত স্মৃতি।

কিন্তু কোনো পুণ্যস্মৃতির আকর্ষণে ওই মহাপরিনির্বাণ স্থানে মন উধাও হয়নি শীলাবতীর। তিনি সেখানে যাচ্ছেন একজনকে গ্রহণ করবেন বলে, একজনকে কাছে টানবেন বলে। খুব কাছে, একেবারে বুকের কাছে। সেখানকার বহু গাইডের মধ্যে যে ছেলেটা একেবারে স্বতন্ত্র, এতবার দেখাশোনার ফলে যে-ছেলেটা এখন তাকে দেখলেই মাদার মাদার বলে কাছে ছুটে আসে। মুখ খুললে অনর্গল প্রায়শুদ্ধ ইংরেজী বলে, গাল-গল্প ফেঁদে সাগ্রহে মহাবিহারের ধূলি-কণা পর্যন্ত চেনাতে চেষ্টা করে তাঁকে, তারপর বিদায় নেবার আগে মুখের দিকে চেয়ে দুষ্টু-দুষ্টু হাসে, বলে–এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কাটালুম, এতসব দেখালুম, ইউ সুড অ্যাটলিস্ট গিভ মি এ ফাইভ-রুপি নোট মাদার।

তাকে। তাকেই আনতে যাচ্ছেন শীলাবতী। নিজের অগোচরে আপন মনে আরো বেশি হাসছেন তিনি। ছেলেটা যেন তার সামনেই দাঁড়িয়ে, হাসছে মুখ টিপে। প্রতিবারের মতোই দুষ্টুমি করে বলছে–মাদার আই অ্যাম রাহুল, রিমেম্বার মি?

একরাশ ঝকড়া কোঁকড়ানো চুল, দেখলেই মন-পাখি ওগুলোর প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠে। ফরসা রঙ অযত্নে তামাটে দেখায়, জোড়া ভুরু, টানা চোখের স্বচ্ছদৃষ্টি সর্বদা চঞ্চল। ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি যেন লেগেই আছে, হাসলে আরো সুন্দর দেখায়। বছর চব্বিশ হবে এখন বয়স, হিসেবে ভুল হবার কথা নয় শীলাবতীর–কিন্তু দেখায় যেন আঠারো-উনিশ। খুব লম্বা নয় একটু রোগা ধরনের, ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে সামনের দিকে একটু ঝোঁক নিয়ে হাঁটে, আর মুখে অনর্গল খই ফোটে।

গেল বারের কথা মনে হতে আরো বেশি হাসি পেল শীলাবতীর। তিন দিন ছিলেন, তিন দিনই মহাবিহারে গিয়েছিলেন। স্কুলে পর পর কয়েকদিন ছুটি থাকলেই গিয়ে থাকেন। গেল বারের তৃতীয় দিনে রাহুল অন্য-দর্শক জুটিয়ে ফেলেছিল তিনি যাবার আগেই। তাকে না পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। অদূরের কতগুলো ভগ্নস্তূপের ফাঁক দিয়ে ছেলেটাই প্রথম দেখল তাঁকে। দেখে তার দল ছেড়ে কাছে এগিয়ে এল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝরল–তুমি আসবে, কাল বলে যাওনি তো মাদার, আই অ্যাম এনগেজড, হাউ-এভার, আ-অ্যাম গিভিং ইউ এ গুড গাইড।

মুখের দিকে চেয়েছিলেন শীলাবতী, হেসেছিলেনও হয়ত একটু আর অল্প মাথা নেড়েছিলেন। অর্থাৎ, তাতে হবে না।

ছেলেটা বিব্রত হয়েছিল, আবার একটু খুশিও হয়েছিল।

–ওয়েট হিয়ার, লেট মি সি।

একটু বাদে দর্শদলটিকে অন্যের হাতে গছিয়ে দিয়ে সে ফিরে এসেছিল।

–কাম অন মাদার, আ-অ্যাম ফর ইউ নাও।

সেদিন শীলাবতী ইচ্ছে করেই ছেলেটাকে জ্বালিয়েছিলেন একটু। এখানে যত স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এক বছর ধরে তার বিবরণ শুনলেও ফুরাবে না। তার প্রদর্শক যে-গল্পই ফেঁদে বসে, শীলাবতী বাধা দেন, বলেন–সত্যের মধ্যে তুমি গল্প মেশাচ্ছ, আমি তো শুনেছি এটা এই, এটার এই-এই ব্যাপার

বার কয়েক থমকে গিয়ে ছেলেটা ঈষৎ বিস্ময় মেশানো কৌতুকে নিরীক্ষণ করেছে তাকে।আর ইউ এ হিস্টোরিয়ান, মাদার?

ইতিহাসে বিশেষজ্ঞা তিনি, সেটা আগে কখনও প্রকাশ পায়নি। আগে কান পেতে তিনি ছেলেটার কথাগুলো আস্বাদন করেছেন শুধু, তাৎপর্য খোঁজেননি। সেদিনও প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে হাসিমুখে বলেছিলেন–কেন, আমার মতো দর্শককে বোঝাতে গিয়ে খুব সুবিধে লাগছে না বুঝি?

অপ্রতিভ না হয়ে ছেলেটা দিব্যি হেসেছিল, বলেছিল–তা কেন, তোমাদের ওই শুকনো ইতিহাস আওড়ালে এখানে লোক আসা ছেড়ে দেবে আর আমাদেরও উপোস। করে মরতে হবে।

-তা বলে লোককে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলবে, সত্যি বলবে না?

বড় বিচিত্র জবাব দিয়েছিল ওই দুষ্ট ছেলেটা। এখনো কানে লেগে আছে। মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসেছিল আর বলেছিল।–এই বানানো গল্পই আমরা সত্যি বলে বিশ্বাস করি, আর লোকেরও বিশ্বাস করতে ভালো লাগে মাদার। ভগবানের মহিমা বলার মধ্যে আবার মিথ্যা কি আছে! তাছাড়া, তোমার ওই ইতিহাস যারা লিখেছে, তারা সব নির্জলা সত্যি লিখে গেছে, তাই বা কি করে জানলে?

এরপর শীলাবতী আর একটাও তর্ক তোলেননি।

আবার হাসি পাচ্ছে। বিদায়ের আগে ছেলেটা মুখখানা গম্ভীর করে তুলতে চেষ্টা করে অসঙ্কোচে বলেছিল–তোমার জন্য একটা বড় দল হাতছাড়া করেছি মাদার, দিস টাইম ইউ সুড গিভ মি এ টেন-রুপি নোট।

টাকা আদায়ের বেলায় ছেলে লাজ-লজ্জার ধার ধারে না। ফস ফস করে বলে বসে। ছদ্ম বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলেছিলেন শীলাবতী।–পাঁচ থেকে একেবারে দশ! কেন, অত টাকা দিয়ে কি হবে?

তক্ষুণি বুঝেছে পাবে। তাই জোর দিয়ে বলেছিল–তোমাদের কাছে আবার অত কি মাদার। কিছু বেশি পেলে একটু ভালো থাকতে পারি, একটু ভালো খেতে পাই, একটু ভালো পরতে পারি–অথচ ও-কটা টাকা তোমাদের কাছে কিছু নয়।

শীলাবতী ওর হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলেন। সেদিন বুকের হাড়-পাঁজর টনটনিয়ে উঠেছিল। আজ হাসছেন। আজ নিজের সঙ্গে সব বোঝাপড়া শেষ বলেই হাসতে পারছেন। অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলছেন কিছু।

বলছেন, রক্তে লেগে আছে সুখের স্বাদ, ভালো থাকতে খেতে পরতে। চাইবে না কেন। দেখি, এবার থেকে কত সুখে থাকতে পারিস তুই, আর তোকে লোকের কাছে হাত পেতে বেড়াতে হবে না!

বাড়ি।

গাম্ভীর্যের বর্ম-আঁটা কর্ত্রীর বদলে এইদিনে একখানা হাসিখুশি মুখ দেখবে, বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকা কটিও আশা করেনি হয়ত। আরো বিস্মিত হল, কত্রী তাদের ঘরে ডেকে এনে ভারি সদয় মুখে দু মাসের করে মাইনে আগাম দিয়ে বিদায় দিলেন যখন। এই রাত পোহালে তারা অন্য কাজ দেখে নেয় যেন, তিনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।

জিনিস-পত্র একরকম গোছগাছ করাই ছিল। স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিলেন। আর যা থাকল, সকালেই হয়ে যাবে। স্যুটকেস থেকে শীলাবতী তাঁর তরুণ গাইডের ছবিটা বার করে টেবিলে রাখলেন। হাসছেন মুখ টিপে। গাইডই বটে। বাকি জীবনটা ওই ছেলের সর্দারীতে চলতে হবে। ছেলেটাও যেন তাই বুঝেই হাসছে তার দিকে চেয়ে।

ছবিটা অনেকদিন আগে শীলাবতী নিজের হাতে তুলেছিলেন। ওর পরিচয় সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হবারও আগে। ওকে দেখে অনেক সম্ভব-অসম্ভব যখন মনের মধ্যে ভিড় করে আসত, তখন। ওকে দেখলে কবেকার কোন বিস্মৃত স্মৃতির উৎসে যখন বান ডাকত, তখন। ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসলে বুকের শুকনো হাড়পাঁজরে যখন সুখের প্রলেপ লাগত, তখন।

তিন বছর আগে এই ছবি যে তিনি তুলে এনেছিলেন সেটা শঙ্কর আচার্যও জানতেন না। যিনি অনেক প্রত্যাশীকে বাতিল করে এই গাইড তাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন। আর সে-সময়ে কিছু গোপন করার জন্য যিনি সন্তর্পণে এক ছদ্ম গাম্ভীর্যের বিবরে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

ছবিটা তুলে এনে শীলাবতী এই ঘরের এই টেবিলেই রেখেছিল। দেখে পরিচিতেরা জিজ্ঞাসা করেছেন, এ কে?...কেউ বা সমনোযোগে দেখে শুধিয়েছেন, ছোট ভাইটাই কেউ নাকি? অনেকটা আপনার মতোই মুখের আদল

না, তখনো শঙ্কর আচার্য তাকে বলেননি এ কে। কিন্তু মর্মস্থলের অনুভূতি দিয়ে যা বোঝবার শীলাবতী বুঝে নিয়েছিলেন। অতিথি অভ্যাগতের প্রশ্ন এবং মন্তব্য শুনলে আশায় উদ্দীপনায় তার মুখ লাল হত। গাম্ভীর্যের আড়াল নিতে হত তাকেও।

শীলাবতীর জীবনে দুটো ঝড় গেছে। একটা ছোট, একটা বড়। যাকে কেন্দ্র করে ওই বড় ঝড়, তিনি শঙ্কর আচার্য।

যা হবার কথা নয়, শীলাবতীর জীবনে একে একে তাই হয়েছে। তাই ঘটেছে। ব্লাডপ্রেসারে কাবু দরিদ্র ইস্কুল মাস্টারের পনের বছরের বিধবা মেয়ে সসম্মানে এম. এ. পাশ করে নিজের দু পায়ে ভর করে একদিন সোজা হয়ে দাঁড়াবে–সে আশা সেদিন সুদূর স্বপ্নের মতো ছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন সত্য হল যখন, তখন এক মর্মান্তিক আঘাতে বুক ভেঙে গেল তাঁর। সেই ভাঙা বুক আর জোড়া লাগেনি।

www.bengaliebook.com

কিন্তু সে সব অনেক পরের কথা। তার অনেক আগে ভবিতব্যের কথা। মেয়ে সুশ্রী, চৌদ্দ বছরে বিয়ে দিয়েছিলেন। এক বছর না ঘুরতে ঝড়জলে নৌকাডুবি হয়ে তরতাজা জামাই খোয়ালেন তিনি। পনের বছরের মেয়ের বৈধব্য দেখলেন। তাও সহ্য করলেন।

গঙ্গার গর্ভে যাঁকে হারালেন, তাকে ভালো করে চেনা হয়নি শীলাবতীর। কিন্তু প্রায় পনের বছর বাদে এক বিচিত্র গোধূলিতে সেই গঙ্গার বুকেই যে একজনকে পেলেন, তাকে একেবারে হেঁটে দিতে কোনোদিনই পারেননি শীলাবতী। আগেও না, পরেও না।

তিনি শঙ্কর আচার্য।

অবস্থাপন্ন, রক্ষণশীল উত্তরপ্রদেশীয় পরিবারের ছেলে। বাড়িতে বারো মাসে তের পার্বণের প্রচলন।

দূর সম্পর্কের আত্মীয় শীলাবতীদের। শীলাবতীর বাবা তাঁদেরই অনুগৃহীত ছিলেন। একই বাড়িতে এক বিচ্ছিন্ন অংশে থাকতেন। শীলাবতী বিধবা হবার পর সেই বাড়ির কৃতি সন্তান শঙ্কর আচার্যই একটা অবলম্বনের পথ দেখালেন। শঙ্কর আচার্য তখন বাইশ-তেইশ বছরের তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নবিশেষ। তাঁর আগ্রহে উৎসাহে উদ্দীপনায় হতাশার মধ্যে একটুকরো আলো দেখলেন দুঃখী পরিবারটি। শীলাবতীর পড়াশুনা চলতে লাগল।

আচার্যগৃহে একটা চাপা সংশয় দেখা গেল আরো সাত-আট বছর পরে। কুলের গৌরব অমন হীরের টুকরো ছেলে বিয়ে করতে চায় না কেন? শঙ্কর আচার্য তখন অধ্যাপনা করেন। ছোট এক ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু তিনি বিয়ের কথা কানেও তোলেন

না। আরো তিন চার বছর বাদে বাড়ির লোকের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল। বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়সেও ছেলেকে বিয়েতে রাজি করানো গেল না।

চেষ্টা শীলাবতীও করেছেন। বলেছেন–ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না। পাঁচজনে পাঁচ রকম ভাবছেন। তার বিয়ে করা উচিত। তার জীবনে শঙ্কর আচার্য বিধাতার পরম আশীর্বাদের মতোই এসেছেন, কেউ তাকে হেয় চোখে দেখলে তার পরিতাপের সীমা থাকবে না।

শঙ্কর আচার্য এ-কথাও কানে তোলেননি। প্রথমে বলেছেন, ও-সব ঝামেলা পোয়ানোর সময় নেই তার। পরে সরাসরি বলেছেন, তিনি পৈতৃক সম্পত্তির প্রত্যাশা রাখেন না, বিধবা বিবাহ করলে আপত্তি কি।

শুনে শীলাবতী কানে আঙুল দিয়েছেন। পরে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কথা তুললে শঙ্কর আচার্য ওই এক কথাই বলেন। শীলাবতাঁকে বেশি বিরূপ হতে দেখলে বলেন, একটা সমস্যাকে বড় করে তুলে লাভ কি, তার থেকে আমি যেমন আছি থাকতে দাও–বিয়ে না করলেও মানুষের দিন কাটে।

তা-ই কাটতে লাগল। এরও তিন বছর বাদে শীলাবতীর শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল। আশাতীত ফলের ঘোষণা যেদিন কানে এল, কৃতজ্ঞতায় শীলাবতীর দুচোখ ছলছল করে উঠেছিল। এই সাফল্যের ষোল আনাই কার প্রাপ্য, এ তার থেকে ভালো আর কে জানে?

সেইদিনই শঙ্কর আচার্য এক সময় তাঁকে জানালেন, কিছু আলোচনা আছে। ব্যবস্থামতো এক জায়গায় সাক্ষাৎ হল দুজনার। তখনো সন্ধ্যা হয়নি। কি ভেবে শঙ্কর আচার্য একটা

নৌকো ভাড়া করলেন। এই দূরের এলাকায় কেউ তাদের চিনবে না। তাছাড়া একটু বাদেই দিনের বিদায়ী আলো নিশ্চিহ্ন হবে।

কিন্তু কথা কিছু হল না। মুখোমুখি দুজনে চুপচাপ বসে রইলেন। মাঝি তার। ইচ্ছেমতো নৌকা বেয়ে চলল।

অনেকক্ষণ বাদে শীলাবতী জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলবে?

শঙ্কর আচার্য হেসে বললেন–অনেক বলব, অনেক বোঝাব ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিছুই বলার নেই, কিছুই বোঝাবার নেই। যা-ই বলি ঘুরে ফিরে সেটা এই ভেসে বেড়ানোর কথাই।

সমস্তক্ষণের মধ্যে আর কথা হয়নি। দুজনে মুখোমুখি বসেছিলেন–মাঝে বেশ খানিকটা ব্যবধান। দুজনে দুজনকে এক-একবার দেখেছেন শুধু।

কিন্তু সেদিন আকাশে ষড়যন্ত্র ছিল। বাতাসে জাদুর মোহ ছিল। ভরা জ্যোৎস্নায় থালার মতো চাঁদের বুকে সব-খোয়ানোর ইশারা ছিল। সেই জ্যোৎস্না-বোয়া জলের কলকাকলিতে সর্বনাশা কানাকানি ছিল।

শঙ্কর আচার্য হাত ধরে নৌকা থেকে নামালেন যখন, শীলাবতী তখনো আত্মবিস্মৃত, বিহ্বল। হাতের স্পর্শেও সর্বাঙ্গ থর থর কেঁপে উঠল।

তারপর রাত্রি। নিঝুম, নীরব রাত্রি। দরজায় মৃদু শব্দ হল। শীলাবতী চমকে উঠলেন। দুই কান উৎকর্ণ। তিনি জানতেন কেউ আসবে। তিনি জানতেন বন্ধ দরজা খুলে দিতে হবে।

খুলে দিলেন।

এই রাতের যৌবন-বাস্তবের আগন্তুককে ফেরাবার সাধ্য তার নেই। ফেরাবার ইচ্ছেও নেই।

সেই বিহ্বলতার মধ্যেই একে একে আরো অনেকগুলো রাত কেটে গেল। দিনের অবসানে উন্মুক্ত দুটি হৃদয়ের একটি প্রতীক্ষা। রাতের প্রতীক্ষা।

এর পর শঙ্কর আচার্যই আত্মস্থ হলেন প্রথমে। তিনি ঘোষণা করলেন শীলাবতাঁকে বিবাহ করবেন।

বনেদী রক্ষণশীল সংসারে যেন বাজ পড়ল একটা। শঙ্কর আচার্যর বাবা নির্মম হয়ে উঠলেন। এদিকে তেমনি বজ্রাহত হয়েছিলেন শীলাবতীর বাবা। তার ওপর বুকে অপমানের শেল বিদ্ধ হল। বৃদ্ধ প্রভু আচার্য বড়ো নির্মমভাবে তাকে শাসালেন, বিশ্বাসঘাতক বেইমান বললেন, সেই মুহূর্তে মেয়ে নিয়ে তাকে দূর হয়ে যেতে বললেন।

সেই মুহূর্তে না হোক, দুদিনের মধ্যে শীলাবতীর বাবা বড়ো আঘাত নিয়ে এই জগৎ-সংসার থেকেই দূর হয়ে গেলেন। ব্লাডপ্রেসারের রোগী, কটুক্তি শুনতে শুনতেই এক সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। মৃত্যুর দু ঘন্টা আগে একখানা হাত তুলে কিছু যেন

নিষেধ করতে চেষ্টা করেছিলেন শীলাবতাঁকে। সেটা আর কেউ না বুঝুক শীলাবতী বুঝেছিলেন।

একটা সামান্য চাকরি সংগ্রহ করে শীলাবতী বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কিন্তু শঙ্কর আচার্য পরিত্যাগ করতে চাননি তাঁকে। স্থির সঙ্কল্প নিয়েই এসেছিলেন। ত্যাজ্যপুত্র হবেন, এতবড় বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত হবেন–বাপের এই ঘোষণারও পরোয়া করেননি। কিন্তু শীলাবতী রাজি হননি। শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন–তোমাকে আমি কোনোদিন চিনতে ভুল করিনি, তবু এখানেই এর শেষ হোক!

তাকে বোঝানো সম্ভব হয়নি।

শেষ সেখানেই হল না। নিজের দেহের অভ্যন্তরেই নতুন বার্তার সূচনা উপলব্ধি করলেন কিছুদিন যেতে না যেতে। আগন্তুক আসছে। শীলাবতী এইবার বিচলিত হলেন একটু। নতুন করে মনস্থির করতে হল আবার। শঙ্কর আচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

শুনে শঙ্কর আচার্য আর এক দফা মত বদলাতে চেষ্টা করলেন শীলাবতীর। অনেক অনুরোধ করলেন, অনেক অনুনয় করলেন, রাগ অভিমান পর্যন্ত করলেন। কিন্তু বিয়েতে রাজি করাতে পারলেন না তাকে। শীলাবতীর এক কথা, যে আসছে তার ব্যবস্থার ভার শুধু তুমি নাও, নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। তোমাকেও আমি তার সঙ্গে জড়াতে বলছি না, তোমার অর্থের জোর আছে, অনেক রকম ব্যবস্থাই তোমার পক্ষে সহজ।

যথাসময়ে সন্তান এসেছে। নির্মম শান্ত চিত্তে শীলাবতী আটদিনের ছেলেকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমার ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। তুমি যে ব্যবস্থা করবে তাই আমি ওর পক্ষে ভালো বলে ধরে নেব।

এর পর অনেকদিন আর শঙ্কর আচার্য তার সঙ্গে দেখা করেননি। তবু একদিন শীলাবতীর কানে খবর এল একটা। শঙ্কর আচার্যের বাবা তাকে বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত করেছেন নাকি! তার বিশ্বাস, তার অবর্তমানে ছেলে শীলাবতাঁকেই ঘরে এনে তুলবে। শীলাবতী ভেবেচিন্তে একটা চিঠি লিখলেন শঙ্কর আচার্যকে। লিখলেন, আমাকে যদি ভালোই বেসে থাক কোনোদিন, বোকামি করে এত বড় শাস্তি তুমি আমার মাথায় চাপিয়ে দিও না। আমার কাজের ব্রত পণ্ড কোরো না, কাউকে ঘরে এনে তার প্রতি সুবিচার করলে আমিই সব থেকে খুশি হব।

তারপর শঙ্কর আচার্য বিয়ে করেছেন, খবরটা পাওয়া মাত্র শীলাবতীর বুক থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গিয়েছিল যেন।

দু বছর চার বছর বাদে এক-একবার দেখা হয়েছে তাদের। আশ্চর্যরকম সহজ হতে পেরেছেন দুজনেই। গোড়ায় একবার মাত্র ক্ষণিকের জন্য এক শিশুর প্রসঙ্গে ঈষৎ কৌতূহল দেখা গিয়েছিল শীলাবতীর। শঙ্কর আচার্য হাসিমুখে বলেছিলেন, জানতে চেও না। তার পক্ষে যা ভালো তাই করেছি।

দশ বারো বছর বাদে শীলাবতী হঠাৎ আর একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন–সত্যি আছে, না গেছে?

-আছে। ভালোই আছে। কিন্তু আজ তোমার দুর্বলতা দেখলে আমি রাগ করব।

শীলাবতী তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করেছেন। কঠিন তাড়নায় নিজেকে কর্তব্যের পথে টেনে নিয়ে গেছেন। অবকাশ কখনো চাননি। অবকাশ শত্রু।

বছর তিনেক আগের কথা। মহাবিহারে এসেছিলেন। সঙ্গে শঙ্কর আচার্য ছিলেন। এই বয়সে নির্লিপ্ত সহজ মেলামেশাটা আরো সহজ হয়েছে।

এত গাইডের মধ্যে শঙ্কর আচার্য খুঁজে পেতে ওই রাহুলকে বার করলেন। ছেলেটা তাকে খুব ভালো করে চেনে আর ভক্তিশ্রদ্ধাও করে মনে হল। হঠাৎ কি মনে হতে হৃৎপিণ্ডের রক্তচলাচল থেমে আসার উপক্রম শীলাবতীর। ছেলেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্থলে এমন একটা আলোড়ন উঠল কেন তাঁর! এই ঈষৎ চঞ্চল মিষ্টি কচিমুখখানা বড়ো কাছের, বড়ো আকাঙ্ক্ষার এক স্বপ্নের চেনা বলে মনে হল কেন তার! শঙ্কর আচার্যের মুখের অভিব্যক্তি যেন অন্যরকম।

সম্ভাবনাটা সমূলে বাতিল করতে চেষ্টা করলেন শীলাবতী। অসম্ভবই ভাবলেন। কিন্তু ছেলেটাকে ভারি ভালো লাগল তার। চটপটে, ছটফটে। মুখে হাসি লেগেই আছে। –আর অনর্গল কথা।

সাহস করে গাইড প্রসঙ্গে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না শীলাবতী। যা ভাবছেন, সত্যি তো নয়ই, উল্টে যে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, তা হয়ত আর গোপন করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু বাড়ি ফিরে একটা অস্বস্তিই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল আবার। শঙ্কর আচার্য বেছে বেছে ওকেই ডাকলেন কেন? সকৌতুকে বার বার তাকেই দেখছিলেন কেন? কিছুকাল বাদে আর এক ছুটিতে শীলাবতী একাই এলেন মহাবিহারে। খুঁজে খুঁজে ওই গাইডকেই বার করলেন। দিব্যি আলাপ জমে উঠল সেবারে।

এরপর মাঝে মাঝেই আসতে লাগলেন তিনি। কয়েকদিনের ছুটি পেলেই আসেন। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাকে যেন টেনে আনে। ছেলেটা মাদার মাদার বলে হাসিমুখে সামনে এসে বঁড়ায়। শীলাবতী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে ইংরেজি বলে কেন, মাতৃভাষা জানে না?

ছেলেটা হেসে বলেছিল, জানে। তবে ছেলেবেলা থেকে মিশনে মানুষ বলে ইংরেজি বলতেই সুবিধে হয়। আরো হেসে মন্তব্য করেছিল, তোমাদের মতো শিক্ষিত দর্শকরে কাছে তার কদরও বেশি হয় মাদার।

ধারণাটা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে আসছিল শীলাবতীর। তার ঘরে ওর ছবি দেখেও তো অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে, কে হয়। তারা তো কিছু কল্পনা করে নি, তারা মিল দেখে কি করে?

আর সহ্য করতে না পেরে শেষে শঙ্কর আচার্যকে চিঠি লিখলেন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, তার ধারণা সত্যি কি না।

দিনকয়েক বাদে জবাব এল, সত্যি।

এই কটা দিন অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়েছিলেন শীলাবতী। জবাব পাওয়ামাত্র দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখের দিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। আত্মস্থ হওয়ার পর প্রথমেই ভয়ানক রাগ হল শঙ্কর আচার্যর ওপর। অন্যের কাছে হাত পেতে জীবিকা অর্জনের পথে ঠেলে দিয়েছেন বলে জীবনে আর যেন ক্ষমা করতে পারবেন না তাকে। অথচ মন বলছে, ওই পথে এসেছে বলেই ছেলেটার অমন সুন্দর অমলিন মুখ আজও। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

রাতের ঘুম গেছে শীলাবতীর। আগের দিনের চেয়ে পরের দিন শরীর বেশি খারাপ মনে হয়েছে। কাজে মন দেওয়া শক্ত হয়েছে। জানার পর আর মহাবিহারে যাননি। সব বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে, সব পিছুটান গেছে। এইবার যাবেন।

মহাবিহারে পৌঁছুলেন যখন, প্রায় বিকেল-দুপুরে সামান্য বিশ্রামের সময় বলে ইচ্ছে করেই দেরিতে এলেন একটু।

খুঁজতে হল না। হাসিখুশি মুখে সাগ্রহে সে নিজেই এগিয়ে এল। বলল, এবারে তুমি অনেক দিন পরে এলে মাদার।

শীলাবতীও হাসলেন।-হ্যাঁ, তুমি ভালো ছিলে?

-পা-ফেকটলি। বাট অয়্যার ইউ অল রাইট মাদার?–তার দৃষ্টিতে ঈষৎ সংশয়।

শীলাবতীর ইচ্ছে হল দু হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে আনেন। হাসিমুখে জবাব দিলেন–ভালোই তো ছিলাম–কেন, তুমি খারাপ দেখছ?

এ-প্রসঙ্গ বাতিল করে দিয়ে ছেলেটা তড়বড় করে বলল–এস, তোমাকে শোনাব বলেই এবারে অনেক নতুন কিছু স্টাডি করে রেখেছি।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে শীলাবতী বললেন–কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে আমার অন্য কিছু কথা ছিল রাহুল।

ছেলেটা হাসিমাখা কৌতুকে দুই-এক মুহূর্ত দেখল তাকে। তারপর চিরাচরিত চঞ্চল ব্যস্ততায় বলল–কথা পরে শুনব, ও দিকে আলো কমে আসছে, আগে তোমাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই, নইলে টাকা আদায় করব কোন মুখে? দিস টাইম অলসো আই এক্সপেক্ট এ টেন-রুপি নোট।

শীলাবতী সতৃষ্ণচোখে চেয়ে আছেন তার দিকে। বললেন–তার থেকে অনেক বেশিই দেব।

রিয়েলি? হাউ লাকি!-খুশির আতিশয্যে মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল, এসো শীগগির, এরপর কিছু দেখতে পাবে না, আরো আগে আসা উচিত ছিল–

অগতা নিরুপায় শীলাবতী অনুসরণ করলেন তাকে। সে পাথর দেখাচ্ছে, মূর্তি দেখাচ্ছে, স্তূপ দেখাচ্ছে, আর মন্তব্য জুড়ছে। কিন্তু শীলাবতীর কানে কিছুই যাচ্ছে না। তিনি শুধু দেখছেন তাকে। খেয়াল হলে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন, অর্থাৎ মনোযোগ দিয়েই শুনছেন যেন তিনি। একবার শুধু তার কথা শুনে বুকের তলায় মোচড় পড়েছিল একটা। একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রাহুল বলছিল, ওটা অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্যের স্তূপ–একেবারে

অজ্ঞাতকুলশীল একজন তপস্যার জোরে তথাগতকে পরিতুষ্ট করেছিলেন-ওটা তার স্মৃতি।

ঈষৎ অসহিষ্ণু মুখে শীলাবতী বলেছিলেন–তা তো হল, আমার কথা শুনবে কখন?

হাসিমুখেই ছেলেটা নিশ্চিন্ত করে তাকে–আমার সঙ্গে থাকলে কেউ তোমাকে যেতে বলবে না, ছটা বাজুক–এই দেখো, মৃগদাব তপোবন। এবারে কত বাড়ানো হয়েছে, আর এত হরিণও তুমি গেল বারে দেখনি-মৃগদাবের গল্প জানো

শীলাবতী মাথা নাড়লেন, জানেন। ছেলে আবার মহা উৎসাহে স্তম্ভ আর মূর্তি আর সংগ্রহ-বিশ্লেষণে মেতে গেল।

ছটা বাজল। ছটা পর্যন্তই নির্দিষ্ট মেয়াদ এখানকার। বড় করে একটা দম ফেলল ছেলেটা। ঈষৎ শ্রান্ত। মিষ্টি করে হাসল তার দিকে চেয়ে। বলল–আচ্ছা, এবারে এস। গল্প করা যাক।

একটা বড় হলের ভেতর দিয়ে কোথায় নিয়ে চলল তাকে জানেন না। লোকজন। চলে যাওয়ায় ফাঁকা পরিবেশ স্তব্ধ লাগছে।

তাকে নিয়ে গোটা হল পেরিয়ে আর একটা বড় হল ঘরে এল সে। সেই ঘরে প্রায় ছাদ-ছোঁয়া বুদ্ধের এক প্রকাণ্ড মর্মর মূর্তি। ছেলেটা সোজা সেই মূর্তির পায়ের কাছে বসে পড়ে সেই পায়েই বেশ আরাম করে ঠেস দিল। নরম করে একটু হেসে বলল–কাজ না

থাকলে আমি এখানে বসে বিশ্রাম করি। ভালো লাগে। তুমি ওই শিলার ওপর বোস মাদার, তারপর বল কি কথা আছে–

শীলাবতী বসলেন। কি এক অস্বস্তি যেন তাকে পেয়ে বসছে। তবু সঙ্কোচ করলে চলবে না। মৃদু শান্ত মুখেই বললেন–তোমাকে আমি নিতে এসেছি, আমার সঙ্গে চল, আমার কাছেই থাকবে তুমি।

এটুকু মাত্র বলে নিজেই বিস্মিত তিনি। শোনামাত্র বিষম অবাক হবে ভেবেছিলেন, হতভম্ব হবে ভেবেছিলেন। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে রাহুল হাসছে মিটিমিটি। তার মুখে চোখে অপ্রত্যাশিত কিছু শোনার চিহ্নমাত্র নেই। এমন সুন্দর হাসিও শীলাবতী আর যেন দেখেননি।

একটু অপেক্ষা করে খুব সহজ মুখে রাহুল বলল-মাদার, তুমি কে আমি জানি। গেল বারে মিস্টার আচার্য বলেছেন। আমার বাবা কে বলেননি, কিন্তু তোমাকে তিনি চিনিয়ে দিয়ে গেছেন। তুমি একদিন এই ইচ্ছে নিয়ে আসবে জেনেই হয়ত তিনি জানিয়ে রাখা দরকার মনে করেছিলেন–

আশায় আশঙ্কায় শীলাবতীর সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলি কাঁপছে থরথর করে। জীবনের চরম কথা অথবা পরম কথা–যা হোক একটা কিছু যেন তিনি শুনবেন এক্ষুনি।

বুদ্ধের মসৃণ পায়ের দিকটায় হাত বুলাতে বুলাতে খুব মিষ্টি করেই রাহুল আবার বলে গেল–দেখো মাদার, জন্মের পর থেকে এত বড় বঞ্চনারও এতটুকু দাগ লাগেনি যাঁর দয়ায়, এই বয়সে তার পায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আজ আর কতটুকু আশ্রয়

তুমি আমাকে দিতে পারো বলো! তুমি কষ্ট পেও না, আমি খুব ভালো আছি। আমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুমি নিরাশ্রয় করতে চেও না মাদার!

উঠল। শান্ত মুখে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

শূন্য ঘর।...সমুন্নত বিশাল-বক্ষ প্রসন্ননেত্র শিলাময় অমিতাভ মূর্তি।

সামনে চিত্রার্পিতা শীলাবতী।

মান

দেয়ালের দিকে কচি আঙুল তুলে তিন বছরের ছেলে জিজ্ঞাসা করত–ও কে?

বিষ্ণুচরণ বলত, তোর মা। আর, ওই তুই, মায়ের দুধ খাচ্ছিস।

কচি ছেলেটা দুষ্টু চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত। কবে মায়ের বুকের দুধ খেত মনে নেই, কিন্তু একটু স্মৃতির মতো কিছু যেন লেগে আছে। তাই ওই মস্ত ছবিটার মধ্যে মজার এক খোরাক পেত সে। স্তনভারের একটি তার মুখে গোঁজা, মুখের চারভাগের তিন ভাগ ওর আড়ালে পড়ে গেছে। বুকের কাপড়ের আধখানা সরিয়ে অন্যটিও তার কচি হাতের দখলে রেখেছে। অর্থাৎ ওটিও তারই সম্পত্তি।

অবোধ শিশুর এই কৌতূহলের আরো একটা কারণ থাকতে পারে। তিন বছর বয়সেই এই মাকে ত্রাসের চোখে দেখত। উঠতে বসতে কর্কশ ধমক, কিল চড়, আছাড়-ঝকানি ছাড়া আদর-টাদর বড় একটা জোটে নি। সেই মা একদিন তাকে এমনি কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াতো, এও হয়ত শিশু-মনের কম বিস্ময় নয়।

বিষ্ণুচরণের তখন আজকের মতো ছবি-বাঁধাই আর ছবি-বিক্রির দোকান ছিল না। সে তখন এক নামকরা ফোটো-স্টুডিওর খাস বেয়ারা ছিল। তার সততা কর্ম তৎপরতা আর উপস্থিত-বুদ্ধির জন্য স্টুডিওর বিদেশী-মালিক পছন্দ করত তাকে, অন্যান্য কর্মচারী আর ফটোগ্রাফাররাও ভালোবাসত। সকলের মাথার উপর তার মাথাটা আধহাত উঁচিয়ে থাকত বলে, স্টুডিওর অনেকে তাকে ডাকত লম্বাচরণ।

বিষ্ণুচরণের চেহারাটা ভব্যসভ্য ছিল, থাকতও বেশ পরিচ্ছন্ন। সাহেবপাড়ায়। স্টুডিও। কত সাহেব-মেম হোমরাচোমরা মেয়েপুরুষ ছবি তোলাতে বা ক্যামেরা কিনতে আসত ঠিক নেই। এর মধ্যে মলিন বেশ-বাস নিজের চোখেই বেখাপ্পা লাগত বিষ্ণুচরণের, তাছাড়া মালিকও অখুশী হত। জামা-কাপড় কেনা বা সে-সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বাড়তি খরচটা সে মালিকের ওপর দিয়েই পুষিয়ে নিত।

বিষ্ণুচরণের ভিতরে ভিতরে একটা সহজাত কৌতূহলের উৎস ছিল। ফোটোগ্রাফাররা কেমন করে ছবি তোলে, সুন্দর সুন্দর মেয়ে-পুরুষেরা এমন হুবহু ছবির মধ্যে কি করে ধরা পড়ে—এই সব জানার প্রতি তার বিষম ঔৎসুক্য। হেড ফোটোগ্রাফারের সঙ্গেই ছিল তার সব থেকে বেশি খাতির। ভদ্রলোক সত্যিকারের শিল্পী ছিল বলেই বিষ্ণুচরণের কৌতূহল প্রশ্রয় পেত। বিনিময়ে বিষ্ণুচরণও তার পাদমূলে অজস্র তৈল সিঞ্চন করত, সর্বদা তোয়াজ তোষামোদ করত তার। অসুখ বিসুখ হলে তার বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নিত, এমনকি সেবা-শুশ্রূষাও করত। তার কাছ থেকেই বিষ্ণুচরণ গোপনে অনেক সুন্দরী মেয়ের ছবির কপি সংগ্রহ করেছিল। আর এই ভদ্রলোকই তার ছবি-তোলা শেখার গুরু।

মালিকের অগোচরে এবং অনুপস্থিতিতে স্টুডিওর দরজা বন্ধ করে গোপনে তার। শিক্ষার মহড়া শুরু হয়েছিল। প্রথমে সস্তা ক্যামেরায় হাত পাকিয়েছিল সে। শিক্ষা-গুরুটি তার মধ্যেও বোধ করি একটা সুপ্ত শিল্পিসত্তা আবিষ্কার করেছিল। তার তৎপরতা, বিচার-বিবেচনা, সহজাত পরিমিতি বোধ, ইত্যাদি দেখে অনেক সময় সে অবাক হয়েছে। অবকাশ সময়ে গোপনে প্রায় কেঁকের বশেই ক্রমশ দামী দামী ক্যামেরায় হাত দিতে দিয়েছে তাকে।

কয়েক বছর যেতে গুরু নিজেই তাকে পরামর্শ দিয়েছে–এখানে বেয়ারাগিরি না করে কোনো ছোটখাটো ফোটোগ্রাফির দোকানে ঢুকে পড়, অনেকের থেকেই ভালো। ছবি তুলবে তুমি।

গুরুটি একাধিকবার তাকে দিয়ে ফ্লাশ-বালবে কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের ছবি তুলিয়ে নিজের বলে চালিয়েও ধরা পড়ে নি।

কিন্তু বিষ্ণুচরণ এতবড় স্টুডিও আর এই গুরু ছেড়ে নড়তে চায় নি। এখানে থেকে উঁচু নজর হয়ে গেছে তার। ক্যামেরা প্রাণের জিনিস, চেষ্টাচরিত্র করে গুরুর সাহায্যে ধারে সস্তার ক্যামেরা একটা অনায়াসে সে কিনতে পারত, কিন্তু অতকাল আগেরও সেই দামী দামী ক্যামেরায় হাত মক্স হওয়ার ফলে সস্তার ক্যামেরা তার মনে ওঠে নি। ভগবান দিন যদি দেন কখনো, ওই দামী ক্যামেরাই একটা হবে তার।

ইতিমধ্যে বিষ্ণুচরণ ঘরে বউ এনেছিল। তাদের ঘরে বেশ সুন্দরী বউ বলতে হবে। মোটা-সোটা গোলগাল গড়ন, ফরসা। বউয়ের রূপ দেখে গুণের দিকে তাকানোর কথা মনেও হয় নি তার। এই না-তাকানোর খেদ ঘোচবার নয়। যাই হোক, বিষ্ণুচরণ। বিয়ে করেছিল এবং যথাসময়ে ছেলে শম্ভুচরণের আবির্ভাব ঘটেছিল।

ছেলের যখন সাত-আটমাস বয়েস, তখনই সেই অভিনব ব্যাপারটা ঘটেছিল। স্টুডিওর মালিক দিন কয়েকের জন্য বাইরে গিয়েছিল। ফলে বিষ্ণুচরণের গুরু সর্বেসর্বা। তখন। সে কাকুতি মিনতি করে ধরেছিল গুরুকে, দুঘণ্টার জন্য একটা ভালো ক্যামেরা দিতে হবে, দুঘণ্টার আগেই সে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করবে

-কার ছবি তুলবি?

— বিষ্ণুচরণ সলঙ্কে জবাব দিয়েছে–আজ্ঞে বউ-ছেলের

ক্যামেরা হাতে পেয়ে হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ি এসেছে। বাড়ি বলতে ব্যারাকের মতো একটা একতলা দালানের দেড়খানা ঘর। আশপাশের ঘরের বাসিন্দারাও সব তারই মতো স্বল্পবিত্তের মানুষ।

দুপুর ভালো করে গড়ায় নি তখনো। ক্যামেরা হাতে বিষ্ণুচরণ ঘরে ঢুকে দেখে বউয়ের ওই মূর্তি। মেঝেতে বসে আছে, মুখের ঘুমের দাগ ভালো করে মিলায় নি তখনো। আদুড় গা। শাড়ির আঁচলটা বুকের একদিক ঢেকে কাঁধে জড়িয়ে আছে অন্যদিকটা অনাবৃত। ঈষৎ ঝুঁকে ছেলের মুখে বুকের আহার যোগাচ্ছে। ছেলের মুখের বেশীর ভাগ ঢাকা পড়ে গেছে, কাপড়ের তলা দিয়ে তার একটা কচি হাত আহারের দ্বিতীয় সম্পদটি আগলে আছে।

দেখা মাত্র বিষ্ণুচরণের বউকে সাজগোজ করিয়ে ছবি তোলার জল্পনা-কল্পনা উবে গেল। ওদিকে কুসুমবালাও এ-সময়ে লোকটাকে দেখে অবাক হয়েছে, আরো অবাক হয়েছে তার হাতের অচেনা বস্তুটা দেখে। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করার আগেই বিষ্ণুচরণ গম্ভীর মুখে বলল–চুপ। কথা বোলো না! নোড়ো না! ঠিক অমনি থাকো! কি মজা। হয় এক্ষুণি দেখো!

কিছু না বুঝেই কুসুমবালা অবাক চোখে চেয়ে ছিল তার দিকে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত যেতেই মজার চোটে সে আঁতকে উঠল প্রায়। মুখের ওপর আচমকা ফ্ল্যাশ-বাল ঝলসে উঠেছে। বৃন্তচ্যুত ছেলেটাও কেঁদে উঠল। কিন্তু বিষ্ণুচরণের কাজ ততক্ষণে সারা। জীবনের একটা পরম মুহূর্তকেই সে যেন ধরে ফেলেছে। দাঁত বার করে সে হাসতে লাগল। আর একটা ছবি তোলার কথাও মনে হল না তার। হাসতে হাসতে, উড়তে উড়তে আবার স্টুডিওয় ফিরে চলল।

সব অভিনব শিল্প-সৃষ্টিই এমনি আকস্মিক কিনা বলা যায় না। যে ছবি তুল বিষ্ণুচরণ, সমস্ত জীবনের সচেতন চেষ্টায় অমন আর দ্বিতীয়টি তুলতে পারবে কিন ঠিক নেই। ছবি দেখে তার গুরু অবাক। ছোট ছবি বড় করা হল, তারপর আরো বড়। শেষেরটা দেড় হাত প্রমাণ হল প্রায়। গুরু বলল–এটা আমায় দাও, স্টুডিওর শো-কেসে রাখি–কেউ জানবে না।

বিষ্ণুচরণ রাজী হল না। ঘরের পরিবারের ছবি যে...

রুচি আছে তার। বড় ছবিখানার ওপর স্টুডিওর সব থেকে সেরা আর্টিস্টকে ধরে-পড়ে পাকা-রঙের কাজ করিয়ে নিল। কার ছবি বা কে তুলেছে ব্যক্ত না করে তাকে দিয়ে এই কাজ করাতে বেশ কয়েক টিন দামী সিগারেট উপঢৌকন দিতে হল। কাজে হাত দিয়ে শিল্পের টানেই যত্ন করে রঙের কাজটুকু করে দিয়েছিল শিল্পী। বিষ্ণুচরণ তখনো বাড়িতে কিছু বলে নি।

দামী ফ্রেমে ছবিটা একবারে বাঁধিয়ে কাগজে মুড়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির হল। একদিন। বউ তখন রান্নায় ব্যস্ত। দেয়ালেও অনেক পেরেক লাগানই আছে।

জায়গা বেছে ছবিটা একেবারে টাঙিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ছবি দেখে কুসুমবালা প্রথমে হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপর তার স্বভাবসুলভ রসনা খনখনিয়ে উঠেছিল।

এই রস করা হয়েছিল সেই দিন, আঁ! আদুড় গায়ে পরিবারকে সকলের চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখার সখ–বলি স্বভাব-চরিত্তির কি একেবারে খেয়ে বসেছ? কি ঘেন্না, কি ঘেন্না, শীগগির নামাও বলছি ওটা, নইলে আছড়ে ভাঙব আমি

বউয়ের বচসায় সচরাচর চুপ করেই থাকে বিষ্ণুচরণ। অসীম ধৈর্য তার। বলতে গেলে মুখ বুজেই সহ্য করে। কিন্তু ক্বচিৎ কখনও সহ্যের সীমা ছাড়ালে তখন একেবারে মারমুখী মূর্তি। তখন অতবড় কুঁদুলে বউও ঘাবড়ে যায়। কিন্তু এই সামান্য কথায় যে ওই মূর্তি দেখবে ভাবে নি।

বিষ্ণুচরণ ছবির দিকে দুপা এগিয়ে গেল, তারপর বউয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অস্বাভাবিক রুক্ষ কঠিনস্বরে শাসালো–ওতে হাত দিবি তো তোর ওই হাত আমি দুমড়ে ভেঙে দেব।

রাগ হলেই তুমি ছেড়ে তুই তুকারি করে।

তবু সামলাতে না পেরে কুসুমবালা অস্ফুট ঝঝে বলে উঠতে যাচ্ছিল–গলায় দড়িও

–যা গলায় দড়ি তুই নিজে দে-গে যা, আমার হাড় জুড়োয় তাহলে।

দিনে দিনে তারপর ওই ছবি কুসুমবালার চোখেও সয়ে গেছে। আড়াল থেকে এক এক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ছবিটা দেখতেও দেখেছে বিষ্ণুচরণ। আর বছর তিনেক বয়েস না হতে ছেলেও ওটা চিনে ফেলেছে। ফেললেও বাপের কোলে উঠলেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করত–ও কে?

.

বিষ্ণুচরণের সংসার-সুখ বলতে কিছু ছিল না। দেখতে দেখতে একদিন সবই ছারখার হয়ে গেল। দুর্যোগ যেন হাঁ করে গিলতে এল তাকে। গিলেই ফেলল। তাকে আর তার সাড়ে তিন বছরের ছেলে শম্ভুচরণকে। বউ জন্মের শোধ নিল।

বউয়ের বুকে বিষ ছিল। মুখে বিষ ছিল। বিষে বিষে বিষ্ণুচরণের হাড় মাস কালি। কারণে অকারণে কোনো স্ত্রীলোকের এত রাগ সে বোধহয় আর দেখে নি। হয়ত রূপের জোরে আরো একটু সচ্ছল ঘরে পড়বে, এ-রকম আশা ছিল বউয়ের। তা না হলে বিষ্ণুচরণের অস্তিত্বটাই ওর চোখে এমন চক্ষুশূল হবে কেন! অবশ্য শুধু তার ওপর নয়, তপ্ত রসনার ঝাটা সে সকলের ওপরেই বুলোয়–ওর ভয়ে তার ঘরে একটা ফেরিঅলা পর্যন্ত আসে না।

অতি ক্ষুদ্র কারণে বিপর্যয় ঘটল একদিন। ঘটবে বলেই হয়ত বিষ্ণুচরণেরও কাঁধে। শনি ভর করেছিল সেদিন।

কি কারণে তার তালা-বন্ধ ট্রাঙ্ক খুলে এক পাঁজা ছবি হাতে পেল বউ। যে ছবিগুলো সে তার গুরুর কাছে চেয়ে-চিন্তে সংগ্রহ করত। বেশির ভাগই নতুন বয়সের ছেলে-মেয়ের ছবি, বিচিত্র বেশ-বাসের অবাঙালী এবং বিদেশী মেয়ের ছবিও আছে। অনেকগুলো। স্বামীর চরিত্রহীনতার এমন জলজ্যান্ত প্রমাণ আর বুঝি হয় না। তার ওপর বিষ্ণুচরণ ভুল করল বউয়ের হাত থেকে ছবিগুলো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে। তার ভয়, বউ ওগুলো নষ্ট করে ফেলবে।

ব্যস, তুমুল ব্যাপার শুরু হল। গলা ছেড়ে স্বামীর গুণকীর্তন বর্ণনা করতে লাগল কুসুমবালা, চরিত্রহীন লম্পট মাতাল বলে তারস্বরে গাল পাড়তে লাগল। আশপাশের বাসিন্দারা সব সচকিত হয়ে উঠল। তারাও কৌতূহলী হয়ে ভাবল, কুঁদুলি বউ হাতে নাতে এমন কিছুই ধরেছে, যার দরুন সাত-সকালে এই সম্ভাষণ আর এমন কুরুক্ষেত্র। তাদের উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে কুসুমবালার স্বামী-ঝাটানোর ক্ষিপ্ত উদ্দীপনা ক্রমশ চড়তেই লাগল।

কতক্ষণ সহ্য করেছিল বিষ্ণুচরণ জানে না। উঠল হঠাৎ। মাথার মধ্যে। দাউদাউ আগুন জ্বলছে।

হাতের পাঁচটা আঙুল আচমকা সাঁড়াশীর মতো বউয়ের গলায় বসে গেল। ঠেলতে। ঠেলতে তাকে খুপরি ঘরটার মধ্যে নিয়ে ঢোকাল। বউয়ের দম বন্ধ, হাত ছাড়ানোর বিফল চেষ্টা–মুখ লাল।

বিষ্ণুচরণ এক ধাক্কায় দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল তাকে। দেয়ালের সঙ্গে লাগল ঠাস করে। বলল, ফের গলা খুলবি তো ওই গলা আমি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেব।

বউ গলা আর খোলে নি। বিষ্ণুচরণ জামা গায় চড়িয়ে তক্ষুণি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

রাগ পড়তে ফিরল ঘণ্টাখানেক বাদে। কাজে বেরুতে দেরি হয়েই গেছে, চাটা করে না-খেয়েই ছুটতে হবে।

বাড়ির কাছে এসে হতভম্ব। লোকে লোকারণ্য। চিৎকার চেঁচামেচি। একটা অজ্ঞাত ভয় বিদ্যুৎকষার মতো আঘাত করল তাকে। তারপরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল।

সেই খুপরি ঘরের দরজা ভেঙে কুসুমবালাকে বার করতে হয়েছে। কুসুমবালাকে নয়, বীভৎস দগ্ধ একটা নারীদেহকে। সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন দিয়েছে কুসুমবালা। তখনো প্রাণ আছে, তখনো আর্ত-যাতনায় প্রাণান্তকর ছটফট করছে।

হাসপাতালে দুদিন বেঁচে ছিল। বেহুস অবস্থায় ভুল বকেছে। এই পরিণামের সমস্ত আক্রোশ সে স্বামীর মাথায় ঢেলে দিয়ে গেছে।

বিষ্ণুচরণের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে নি। কাদার অবকাশও সে পায় নি। একটা মৃত্যু তাকেও নিঃসীম মৃত্যুর দিকেই টেনেছে। পুলিশের টানা-হেঁচড়ায় একটানা দেড়মাস দেহের রক্ত শুকিয়েছে, রাতের ঘুম গেছে। দুধের ছেলেটাকে পাশের ঘরের একজন আশ্রয় দিয়েছে বটে, কিন্তু তার কান্না সে-যেন কোর্ট আর থানায় দাঁড়িয়েও শুনেছে।

দেড় মাস বাদে মুক্তি পেল। মুক্তির বোঝ টেনে টেনে কোনো রকমে বাড়ি এল। প্রথমেই চোখে পড়ল দেয়ালে টাঙানো কুসুমবালার সেই মস্ত বাঁধানো ছবিটা। একটানে দেয়াল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এল সেটা। আছড়ে ভাঙতে গিয়েও ভাঙতে পারল না। ওটা শুধু কুসুমবালাই নয়, তারও ভিতরের একটা সৃষ্টি। কিন্তু ছবিটার দিকে আর তাকাতে পারল না, যে আগুনে কুসুমবালা মরেছে তার থেকে বেশি আগুন ওর বুকে সে জ্বেলে রেখে গেছে।

ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা একটা বড় কাগজে প্যাক করে ঘরের কোণে চোখের আড়ালে রেখে দিল। পরে ঘর থেকে সরাবে। দেয়ালের গায়ে চৌকো কালো দাগ পড়ে আছে একটা। গামছা ভিজিয়ে ঘষে দাগটা তুলে ফেলল। তারপর ছেলে শম্ভুচরণকে নিয়ে এল।

গোড়ায় গোড়ায় ছেলে কয়েকদিন আঙুল দিয়ে শূন্য দেয়ালটা দেখিয়ে ছবির খোঁজ করেছে, তারপর ভুলে গেছে।

দুর্যোগ একা আসে না। আসেও নি। স্টুডিওতে গিয়ে শোনে তার ফোটোগ্রাফার গুরু বড় কাজ নিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেছে। সেই সুযোগে ঈর্ষা যারা করত, তার মালিককে জানিয়েছে প্রশ্রয় পেয়ে বিষ্ণুচরণ কি-ভাবে দামী দামী ক্যামেরা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করত। ফলে মালিকও আর তাকে নেয় নি।

দুই-একটা ছোটখাটো দোকানে বিষ্ণুচরণ ফোটোগ্রাফার হতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে দেখল, মূর্খ হয়েও ভিতরের আগ্রহের তাড়নায় যেটুকু শিখেছিল,

পেশাদারীর পরীক্ষায় তার সবটাই অচল। কাঁপা হাতে দুই একটা ছবি যা তুলেছে তারপর আর কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নিজেই দাঁড়ায় নি।

.

প্রায় বিশ বছর কেটে গেছে তারপর।

বড় রাস্তার ফুটপাথের গা-ঘেঁষা ছবি-বাঁধাই আর ছবি-বিক্রির দোকান বিষ্ণুচরণের। আগে ফুটপাথে ঘুরে আর বসেই ছবি, রঙিন ক্যালেণ্ডার, ম্যাপ ইত্যাদি বিক্রি করত। তারপর দেড়-হাত প্রমাণ বসার জায়গা পেয়েছিল একটা, পেয়েই ছবি বাঁধাইয়ের কাজ শুরু করেছিল।

এখন মাঝারি সাইজের দোকান-ঘর হয়েছে একটা। ঘর ভরতি ছবি ঠাসা–ছবির ছোটখাটো গুদাম একটা। সারি সারি তাকে থাকে-থাকে ছবি–আর এত ছবি টাঙানো যে দেয়াল দেখাই যায় না। দেশ-বিদেশের মনীষীদের ছবি, রাজপুরুষদের ছবি, রাজনীতিজ্ঞদের ছবি, ধর্মাত্মাদের ছবি, পৌরাণিক ছবি, যৌবনোজ্জ্বল চিত্রতারকাদের ছবি, দেব-দেবীর ছবি, স্বর্গের ছবি, নরকের ছবি, কল্পিত যৌবনাভিসারিকাদের ছবি –নেই এমন ছবি নেই।

ছবি বাঁধাইয়ের জন্য স্বল্প বেতনে কারিগর রাখতে হয়েছে একজন। সারাক্ষণ মুখ গুঁজে বসে সে ছবির মাপে ফ্রেম ঠিক করে, বোর্ড কাটে, কাঁচ কাটে, হাতুড়ি দিয়ে চুক চুক করে। অবকাশ সময়ে ছেলে শম্ভুচরণ নিজেও ছবি বাঁধে-বাঁধাইয়ের কাজ সেও শিখেছে।

সম্প্রতি বাপ আর ছেলের একটাই বাসনা সর্বদা বুকের তলায় শিখার মতো জ্বলছে। পাশের চিলতে খুপরিটা খালি হয়েছে, সেটা পেয়ে গেলে দোকানটা মনের মতো করে সাজানো চলে। এই স্বল্প পরিসরে খদ্দের নড়তে চড়তে পারে না, অনেক খদ্দের ফিরেও যায়। ওই জায়গাটুকুর মালিকের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে হন্যে হয়েছে। বাপ ছেলে। ওই চিলতে খুপরির জন্য সাড়ে সাতশ টাকা সেলামী হেঁকে বসে আছে। সে–এক কপর্দকও নামাবে না। কায়ক্লেশে ঘরের জিনিস বেচে সাড়ে তিনশ টাকা সংগ্রহ করে তার হাতে-পায়ে ধরেছে বিষ্ণুচরণ–বাকি টাকাটা মাসে মাসে ভাড়ার সঙ্গে মিটিয়ে দেবে কথা দিয়েছে। কিন্তু মালিক কর্ণপাত করে নি।

বাকি চারশ টাকা ধার পাবারও অনেক চেষ্টা করেছে বাপ-ছেলে মিলে, কিন্তু তাদের ধার দেবে কে?

তবু বিষ্ণুচরণ আশা ছাড়ে নি এখনো, মালিকের আড়ালে অশ্লীল কটু-কাটব্য করে। তার এই মস্ত ঢ্যাঙা শুকনো পাকানো দেহের কোথাও কমনীয়তার লেশমাত্র নেই। ছেলেকেই শুনিয়ে বলে, ওটা না পেলে শালাকে খুন করব আমি।

শম্ভুচরণের বয়স এখন তেইশ। বাপের মতো লম্বা নয় আদৌ। সুশ্রী সভ্যভব্য। তার ওপর অনেক মেহনত করে আর দোকানে খেটেও তৃতীয় বিভাগে একটা পাস দিয়েছে। অর্থাৎ রীতিমতো শিক্ষিত সে। ফলে বাপের সঙ্গে আদৌ বনে না তার। এক ধরনের সততার আদর্শ কেমন করে যে ছেলের ভিতরে দানা বেঁধেছে, সেটা আশ্চর্য। ওদিকে বাপ ঠিক উল্টো। সততার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। মুখের দিকে তাকিয়েই খদ্দেরের মন আর পকেট ওজন করতে পারে যেন। সুবিধে বুঝে দরও হাঁকে। খদ্দের চালাক না হলে

রাতকে দিন বানায়, নকলকে মৌলিক বলে চালায়। অল্পবয়সী মেয়েরা আসে ছবি কিনতে, সভ্য-ভব্য ছেলের দিকে আড়ে আড়ে তাকায় বিষ্ণুচরণ। ছেলে সবিনয়ে দর বলার আগেই একটা দর হেঁকে বসে সে। বলে–ওই ছবির ওই দাম...মায়েরা বাজার ঘুরে দেখে আসুন, তফাৎ বুঝবেন।তারপরই সেই ছবির প্রসঙ্গে মিথ্যে আজগুবি গল্প ফেঁদে বসে। শম্ভুচরণ অস্বস্তি বোধ করে।

শুধু এই নয়। খদ্দের বুঝে নিরিবিলিতে গুদামের কোণাঘুপচি থেকে এমন সব ছবি বার করে বাবা, যা দেখলে শম্ভুচরণের কান লাল হয়। অশ্লীল, নগ্ন ছবি। কোথা থেকে যে এসব সংগ্রহ করে ভেবে পায় না। আর এই সব ছবিই চড়া দামে বিকোয়। এক একটার অবিশ্বাস্য দামও মেলে। এই সব কারণে, ছেলে কোনোদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি বাপকে।

.

সেদিন এই বাপ-ছেলের বিধাতা একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন বোধ করি। নইলে এ রকম হবে কেন!

রাত নটা বাজে। দোকান বন্ধ করার উদ্যোগ করছিল তারা। পাঁচ-ছটি বিদেশী শ্বেতাঙ্গ খদ্দের এসে ঢুকল। বয়েস কারো বেশী নয়। শাঁসালো টুরিস্ট সম্ভবত। খাঁটি দেশীয় নিদর্শন সংগ্রহের আশায় এসেছে। দুই-একজনের মুখ থেকে মদের গন্ধও নাকে আসছিল।

বিষ্ণুচরণ লাফিয়ে উঠল–আইয়ে আইয়ে সাব

এদের থেকে প্রিয় আর বোধ হয় কেউ নয় বিষ্ণুচরণের। গেল যুদ্ধে এদের মতো দিলদরিয়া খদ্দেরের কল্যাণেই তার দোকানঘর হয়েছে।

তারা মিটি মিটি হাসে আর ছবি দেখে। কিন্তু লাস্যময়ী অপ্সরা থেকে হাস্যময়ী চিত্রতারকা পর্যন্ত কারো ছবি পছন্দ হয় না তাদের। মাথা নাড়ে আর বলে, দিশি জিনিস দেখাও।

এবারে গোপন সংগ্রহের দিকে হাত দিল বিষ্ণুচরণ। নির্ভেজাল জিনিসই বার করল। একটা চোখে লাগাতে পারলে দূর যা হাঁকবে সে-ই জানে। ঘাড় বাঁকিয়ে সেই সব ছবির দিকে তাকিয়ে শম্ভুচরণের মুখ লাল। কুৎসিৎ সব ছবি।

কিন্তু যে দেশের লোক এই খদ্দেররা, তাদের চোখে এসব ছবি কিছুই নয়। তা ছাড়া এ জিনিসও ঠিক চায় না তারা। এ বিষ্ণুচরণের রোখ চেপেছে। কয়েকটা অর্ধনগ্ন আদিবাসীর বড় ছবি শিল্পী দিয়ে আঁকিয়ে এবং বাঁধিয়ে কোনো এক থাকে লুকিয়ে রেখেছিল। খুঁজে খুঁজে একটা বড় ফ্রেম টেনে বার করল। একটানে ওপরের কাগজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

তার পরেই তড়িৎস্পৃষ্টের মতো কাঠ একেবারে। বিমূঢ় হতভম্ভ।

শ্বেতাঙ্গ খদ্দেররা বাঁধানো ছবিটা তার হাত থেকে টেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখে-মুখে আগ্রহ দেখা গেল। এই ধরনের দিশি জিনিসই তারা চেয়েছিল যেন। ফ্রেমের ওপরে কিছু ধুলো জমেছিল নিজেরাই রুমালে করে মুছে দিল। ছবির তাজা রঙ ফুটে বেরুলো। ওটা হাতে হাতে ঘুরল তাদের। ভারি পছন্দ হয়েছে। খাঁটি দিশি জিনিস –আদুড় গায়ে

শাড়ি জড়িয়ে সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহস্থবধু বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে ছেলেকে –কচি শিশুর অন্য হাতে খাদ্য আগলানো দেখেও খুশীতে আটখানা তারা।

একজন জিজ্ঞাসা করল, দাম কত?

অনুভূতিশূন্য মূর্তির মতো ছবিটা হাতে নিল বিষ্ণুচরণ। দেখল ফ্রেমটায় ছাতা পড়েছে শুধু, নইলে এতকাল আগের ছবি ঠিক তেমনি জীবন্ত এখনো। বিমূঢ় নেত্রে ছেলের দিকে তাকালো একবার। ছেলেও বাপের হঠাৎ এই মূর্তি দেখে অবাক হয়েছে।

বিষ্ণুচরণ দেখছে। বউ চেয়ে আছে তার দিকে। তার চোখে যেন ভৎর্সনা। সে যেন ফিস ফিস করে বলছে-ছিঃ আমি না-হয় অন্যায়ই করেছি একটা, তা বলে নিজের পরিবারকে বেচে দেবে?

ক্রেতারা অসহিষ্ণু হচ্ছে। বিষ্ণুচরণ একটা উদগত অনুভূতি সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে জানালো, এ ছবি বিক্রির না।

লোকটা দাও মারতে চায় ভেবে একবারেই চড়া দাম হাঁকল একজন।

বিষ্ণুচরণ মাথা নাড়ল।

তারা আরো দাম বাড়ালো।

আরো।

বিষ্ণুচরণ মাথা নাড়ল।

আরো খানিকটা দামাদামি করে তারা রাগতভাবে হুড়মুড় করে নেমে গিয়েও তখুনি আবার ফিরে এল। যে লোকটা বেশি মদ খেয়েছিল সে বিষ্ণুচরণের মুখের সামনে ধবধবে পাঁচটা আঙুল তুলে বলল, দেখো পাঁচশো রুপয়া দেগা, উইল ইউ সেল?

বিষ্ণুচরণের মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখের সামনে তার বড় দোকান ভাসছে পাশের চিলতে খুপরি পেয়েছে। শুধু তার চোখে নয়, ছেলের চোখেও তাই ভাসছে।

..ছিঃ, আমি না হয় অন্যায়ই করেছি একটা, তা বলে নিজের পরিবারকে বেচে দেব?....

বিষ্ণুচরণ মাথা নাড়ল। হঠাৎ রেগে গিয়ে জোরেই ঝঝিয়ে উঠল–এ ছবি বিক্রির নয়!

তারা চলে গেল। ছেলে বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে আছে তার দিকে। এক ঝটকায় ছবিটা হাতে নিয়েই বিষ্ণুচরণ দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

দোকান বন্ধ করে শম্ভুচরণ ঘরে ফিরল। দেখল ছবিটা দেয়ালে টাঙিয়ে বাপ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ছেলেও ভিতরে এসে দাঁড়াল। পিছন থেকে দেখল ছবিটা। গোটা মুখ থমথমে গম্ভীর। তেইশ বছরের ছেলে জিজ্ঞাসা করল, ও কে?

বিষ্ণুচরণ আস্তে আস্তে ফিরল তার দিকে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচক করছে। বলল–তোর মা। আর, ওই তুই-মায়ের দুধ খাচ্ছিস।

দুজনেই নির্বাক। ছেলের থেকে বাপ অনেক লম্বা। মুখ তুলে মুখ দেখতে হয়। আজ এই বাপের মাথাটাই হঠাৎ এত উঁচুতে মনে হল শম্ভুচরণের যে ঘাড় উঁচিয়েও ভালো করে দেখা যায় না।

সম্পাদক

কলকাতা থেকে ট্রেনে উনিশ মাইল মাত্র পথ। শহরের এত কাছে এমন অজপাড়াগাঁও আছে জানতাম না। অবশ্য তখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছুই নি আমরা। ট্রেনে বসে গাঁয়ের কথা শুনছিলাম। বক্তা শ্রীবিলাসবাবু। ট্রেনের ঝকানিতে ঝিমুনি আসছিল। তাই দেখে আমাদের চলনদার শ্রীবিলাসবাবু পান্‌সিক্ত ঠোঁটে একটু সঙ্কোচের হাসি মিশিয়ে বলল, আপনাদের কষ্ট হবে, এখনো দেড় ঘণ্টার পথ।

আমাদের কষ্ট হবে, এই কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে অনেকবার বলেছে শ্রীবিলাসবাবু। অথচ তারই অনেক দিনের কর-জোড়ের আকুতিতে আমাদের পা বাড়ানো। কিন্তু আরো দেড় ঘণ্টার পথ শুনে অবাক হলাম। আধ ঘণ্টা হল ট্রেন ছেড়েছে, কিছুটা পথ এসেছিও। উনিশ মাইলের বাকিটুকু যেতে আরো দেড় ঘণ্টা লাগবে কেন!

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, দেড় ঘন্টা লাগবে কেন আরো?

জবাবে শ্রীবিলাসবাবু ভয়ে ভয়ে একবার কোণের জানালার দিকে তাকালো। ওই কোণে ঠেস দিয়ে স্থূলবপু ভবনাথবাবু বসে। আজকের অনুষ্ঠানের তিনিই সভাপতি। তাকে নিয়ে যাবার জন্যেই শ্রীবিলাসবাবুর এতদিনের এত তোড়জোড়, এত কাকুতিমিনতি।

জানালা-ঘেঁষা কোণটায় পিঠ আর মাথা ঠেকিয়ে ভবনাথবাবু চোখ বুজে বসে আছেন। খুব সম্ভব ঘুমুচ্ছেন।

তবু গলার স্বর আর একটু খাটো করে শ্রীবিলাসবাবু অপরাধীর মতো ঢোক গিলে বলল, ইয়ে, আপনার গিয়ে তাই তো প্রায় লাগবে, ধামুয়া থেকে দেড় ক্রোশটাক তো আবার গরুর গাড়িতে যেতে হবে-তা আজ্ঞে আমি আপনাদের জন্যে খুব তেজি বলদের গরুর গাড়ি ঠিক করে এয়েছি, কিছু কমও লাগতে পারে।

এইবার আমি বেশ ভয়ে ভয়ে ওই কোণের দিকে তাকালাম। ভবনাথবাবু ঘুমিয়েই পড়েছেন, আপাতত কিছু কানে যায় নি হয়ত। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে তাঁর মুখের দিকে তাকানো শক্ত হবে। আমারই বিশেষ সুপারিশে তার আসা। একটু দমে গিয়ে। বললাম, গরুর গাড়ির কথা আগে বলেন নি তো?

এই অসুবিধের কথাটাও বলে ফেলার পর শ্রীবিলাসবাবুর সঙ্কোচ গেছে। এই রকমই রীতি তার। একবার ব্যক্ত করে ফেলার পর, ওটুকু অসুবিধে কিছুই না, বলে নিজেই আবার উড়িয়ে দেয়। বলল–তা আজ্ঞে ও তো প্রায় সবাই জানে–কিন্তু আপনাদের একটুও খারাপ লাগবে না, শহুরে মানুষ গরুর গাড়িটাড়িতে তো চড়েন না–ভালোই লাগবে।

অতএব সেই ভালো লাগার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হতে চেষ্টা করলাম।

গাঁয়ের প্রসঙ্গ ছেড়ে শ্রীবিলাসবাবু হঠাৎ একসময় সবিনয়ে নিবেদন করল, এবারে আপনারা সেই মহিলাটিকে একটু দেখবেন কিন্তু, আপনারা বিদ্বান পণ্ডিত লোক কি ব্যাপার ভালো বুঝবেন–

আমি অবাক–কোন মহিলা?

এ-রকম বিস্মৃতি শ্রীবিলাসবাবুর ভালো লাগল না বোধ হয়, ঈষৎ আহত বিস্ময়ে সে-ও ফিরে তাকালো আমার দিকে। তারপর স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করল–সেই যে কনকদেবীর কথা বলেছিলাম আপনাদের, কবিতা বলেন—

মনে পড়ল। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে এক গ্রাম্য মহিলার প্রসঙ্গ শ্রীবিলাসবাবু দুই-একবার উত্থাপন করেছিল বটে। কিন্তু তার বলার আগ্রহের সঙ্গে আমাদের শোনার আগ্রহের। তেমন যোগ ঘটে নি বলে সবিস্তারে কিছু জানা হয় নি। শুধু এইটুকু মনে আছে, মহিলা লিখতে পড়তে জানেন না; অক্ষরপরিচয়ও নেই, অথচ তার মুখে অনর্গল কাব্য-ঝরে। শোনার মতোই কাব্য, গঁয়ের লোকেরা শুনে অবাক হয়।

বললাম–তা তাকে কি দেখব?

শ্রীবিলাসবাবু জবাব দিল–আমাদের শুনতে ভালো লাগে, এই পর্যন্ত আমরা কতটুকু আর বুঝি বলুন। আপনারা হলেন গিয়ে জহুরী, একনজর দেখলে বা দুলাইন শুনলেই কোন দরের জিনিস, ঠিক বুঝে নেবেন।

অক্ষরজ্ঞানবর্জিত মহিলার কবিতার পাল্লায়ও পড়তে হবে জেনে বিরক্তির বদলে অসহায় বোধ করতে লাগলাম। ট্রেনে যখন উঠে বসেছি, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুবার আগে নামার প্রশ্ন নেই। কিন্তু ফেরার সময়, আর ফেরার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত আমার ওপর দিয়ে দস্তুরমত একটা ধকল যাবে। অদূরের জানালায় তন্দ্রামগ্ন ভদ্রলোককে যেমন নিরীহ দেখাচ্ছে, আদৌ তেমনটি নন তিনি। তার রসনার পাল্লায় পড়লে অনেক হোমরাচোমরা ব্যক্তিও চুপসে যান। একটু আগে ভাবছিলাম, পরের দুর্ভোগ যা হয় হোক, আজকের

সভাস্থলে মান বাঁচলে বাঁচোয়া। কিন্তু নিরক্ষরা রমণীর কাব্যাঘাতের সম্ভাবনায় সেই আশাও দূরে সরতে লাগল। মুখের ওপর সেখানে কি যে বলে বসবেন। ভবনাথবাবু, ঠিক নেই। যাদের এ অভিজ্ঞতা আছে, ভাবতে গেলে তাদের অন্তত গায়ে জ্বর আসার কথা।

শ্রীবিলাসবাবুকে সময়ে সতর্ক করে রাখা উচিত। কিন্তু সে অবকাশ মেলা ভার। সাগ্রহে কর্কদেবী প্রসঙ্গ বিস্তারে মন দিয়েছেন তিনি। যা বলে গেলেন তার সার কথা, গাঁয়ের এক মানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা কনকদেবী। পণ্ডিতের কথকতায় নাম ছিল খুব, শোনার জন্য পাঁচ গাঁয়ের লোক ভিড় করে আসত। ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিন বছরের মধ্যে একটি মাত্র সন্তান কোলে সেই মেয়ে বিধবা হতে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি কিছুটা ম্লান হয়েছিল। বিধবা হওয়ার পর থেকে ছেলে নিয়ে কন্যাটি বাপের কাছেই থাকতেন। বাপের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছলই ছিল, জমি-জমাও মন্দ রেখে যান নি। বাপ চোখ বুজতে পুঁজি ভাঙ্গিয়ে, আর কিছু কিছু জমি বিক্রি করে ছেলেকে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন কনকদেবী।বড় আশা ছিল ছেলেটা মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু তা হল না। ছেলে উল্টে বিপথে পা বাড়ালো। তার মতি ফেরানোর জন্য মায়ের সেই বুক চাপড়ে কান্না, গোঁ ধরে একটানা দু-তিনদিন নিরস্তু উপোস করা–এ-সব শ্রীবিলাসবাবুরাই স্বচক্ষে দেখেছে, শুনেছে। ছেলে এখন উড়িষ্যায় কোন কারখানায় চাকরি করে। বিয়ে-থা করেছে, ছেলে পুলে হয়েছে–কিন্তু ভুলেও একবার মায়ের খোঁজ নেয় না, মাকে দেখতে আসে না। ছেলের ব্যবহার মায়ের বুকে শেলের মতো বিধত, পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন দিনরাত। কনকদেবী শ্রীবিলাসবাবুর থেকে বয়সে খুব বেশি বড় হবেন না, তবু শ্রীবিলাসবাবু তাকে মাসী বলে ডাকে। তার ছেলে সত্যবিলাস দিদিমা ডাকে। ছেলেটা খুব ছেলেবেলা থেকেই এই দিদিমার, নেওটা। তাকে ভোলাবার জন্য আর খুব সম্ভব নিজের শোক ভোলবার জন্যেই কনকদেবী অনেক সময়

মুখে মুখে ছড়া পাঁচালি বলে যেতেন। ছেলে যত হাঁ করে শুনত, তার মুখে মুখে কাব্য-কাহিনী বানানোর ঝোঁকও তত বাড়ত। ছেলে বড় হতে তার বন্ধুবান্ধবেরাও কাব্যের শ্রোতা হয়ে পড়ল। এইভাবেই ব্যাপারটা রটে গেল। মুখে মুখে অজস্র কাব্যকাহিনী রচনা করেন তিনি, ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ীরা দল বেঁধে এসে শুনতে বসে। শোনে আর অবাক হয়। শ্রীবিলাসবাবুর ছেলে এখন ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। সে দিদিমার একটা কাব্যের খাতা করেছে। দিদিমা কাব্য বলে, আর সে লেখে। কনকদেবী অক্ষর চেনেন না, কিন্তু কোন পাতায় কোন কবিতা লেখা আছে, একবার চোখ বুলিয়েই তা বলে দিতে পারেন। ওই খাতাখানাই এখন প্রাণ তাঁর। সত্যবিলাস বা লিখতে জানে এমন কেউ তাঁর ঘরে এলেই আদর যত্ন করে জলটল খাইয়ে মহিলা খানিকটা কবিতা লিখিয়ে নেন।

এখন যে সামান্য একটু জমি আছে, শ্রীবিলাসবাবুদের চেষ্টায় তারই চাষের সামান্য আয়ে কায়ক্লেশে কোনোরকমে দিন চলে কনকদেবীর। কিন্তু এই কষ্টের জন্য এতটুকু তাপ-উত্তাপ বা খেদ নেই তার। দিনান্তে কাউকে ধরে দু-চার লাইন কবিতা লেখাতে পারলেই খুশী তিনি, আর কিছু চান না।

–আপনারা, বিশেষ করে ভবনাথবাবুর মতো এমন একজন নামজাদা ব্যক্তি গাঁয়ে আসছেন শোনার পর থেকে ভেতরে ভেতরে খুব একটা উত্তেজনা চলছে ভদ্রমহিলার।

উত্তেজনার কারণ সভয়ে অনুমান করতে পারছি। তবু জিজ্ঞাসা করলাম–কেন?

-আপনারা আসছেন শুনেই উনি খাতাটা আপনাদের একবার দেখাবার জন্যে ধরেছেন যে।–শ্রীবিলাসবাবু মাথা চুলকে বলল–আমি কথা দিয়েছি চেষ্টা করব। সেই থেকেই তাঁর

কখনো আনন্দ, কখনো ভয়। যখন ভাবেন আপনারা ভালো বলবেন, তখন খুশীতে ভরপুর, আবার যখন মনে হয় আপনাদের ভালো নাও লাগতে পারে, তখন ভয়ানক মুষড়ে পড়েন। শ্রীবিলাসবাবু নিজের মন্তব্য যোগ করল, আমরা অবশ্য তেমন বুঝি নে, তবু মনে হয় আপনাদের ভালোই লাগবে, আর সত্যি ভালো লাগলে কিছু সুবিধেও হতে পারে।

ভদ্রমহিলা অর্থাৎ কনকদেবীর প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মনে মনে। শ্রীবিলাসবাবুর মুণ্ডপাত করলাম। তার দিকে তাকিয়েই বোঝা গেছে, আমাদের যে ভালো লাগবেই এ-আশ্বাস সে মহিলাটিকে দিয়েছে, আর ভালো লাগলে যে দু-একটা কবিতা ছাপার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে সে কথাও নিঃসন্দেহে বলেছে।

নির্লিপ্ত গম্ভীর মুখে প্রস্তাবটা গোড়াতেই হেঁটে দিতে চেষ্টা করলাম।

-একদিনে এ-সব হবে-টবে না, অন্য একদিন দেখা যাবে, আজই এ-সব নিয়ে ওঁকে বলতে গেলে উনি অসন্তুষ্ট হবেন।

উনি অর্থাৎ ভবনাথবাবু। শ্রীবিলাসবাবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল একবার। জানালার কোণে ঠেস দিয়ে তেমনি তন্দ্রামগ্ন। আবার আমার দিকে ফিরে মুখখানা করুণ করে ফেলল শ্রীবিলাসবাবু, যেন তারই কবি-মূল্য যাচাইয়ের প্রস্তাবটা নাকচ করা হল। সানুনয়ে বলল, ভদ্রমহিলা বড় আশা নিয়ে বসে আছেন স্যর, আপনারা এটুকু অনুগ্রহ না করলে ভারি হতাশ হবেন।

বিরক্তি গোপন করার জন্যেই বাইরের দিকে চোখ ফেরালাম। আমার বিরক্তি এবং অস্বস্তির কারণ শ্রীবিলাসবাবুর সঠিক বোঝার কথা নয়। এক নামী সাপ্তাহিক পত্রের ডাকসাইটে সম্পাদক ভবনাথবাবু। নিক্তির ওজনে লেখা বিচার করেন। লেখা ছাপার জন্যে কেউ সুপারিশ করতে এলে সেই লেখা না পড়েই বাতিল করেন। একান্ত পরিচিতজনেরাও এই রসকষশূন্য প্রায়বৃদ্ধ সম্পাদকটিকে রীতিমত সমীহ করে চলে। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে যত না নাম তাঁর, তার থেকেও বেশি সুনাম অথবা দুর্নাম, কঠিন সমালোচক হিসেবে। অনেক নামী সাহিত্যিকের লেখা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখেছি। আমরা লেখা না দিলে ঠাস ঠাস কথা শোনান, আবার দিলেও কপালে কি আছে ভেবে শঙ্কায় ভিতরটা ভরে ওঠে।

আমাদের ধারণা এ-দেশের মেয়েদের লেখার ব্যাপারে ভদ্রলোকের এক ধরনের অ্যালার্জি আছে। মনে হয়, মেয়েরা লিখবে সাহিত্য করবে, এটা বোধ হয় তার পছন্দ নয়। শুধু সংসার আর ঘর-করনা নিয়ে থাকুক তারা, মনে মনে এই চান হয়ত। তার নির্মম বিচারের ফলে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে মেয়েদের লেখাই বেশি জমে। লেখা কেন ছাপা হল না জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন, লেখা হলে ছাপা হত।

ভদ্রলোক সবথেকে বেশি রেগে যান কোনো মহিলা লেখা নিয়ে নিজে তার দপ্তরে হাজির হলে। স্বল্প দুই-এক কথায় তাকে জানিয়ে দেন, ট্রাম-বাসের পয়সা খরচা করে না এসে, ডাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত।

একবার একজন আমতা আমতা করে বলেছিলেন–ডাকে পাঠালে লেখা অনেক সময় ঠিক জায়গামত পৌঁছয় না।

ভবনাথবাবু জবাব দিয়েছিলেন–নিজে নিয়ে এলেও জায়গামত পৌঁছয় না।

তিন-চারদিন আগেও এমনি একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। উত্তর-তিরিশ এক সুশ্রী মহিলা লেখা নিয়ে এসেছিলেন। তার ইচ্ছে, লেখাটা তখনই পড়ে দেখা হোক। লেখাটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন, পরে খবর পাবেন।

মহিলা চলে যেতে উল্টে-পাল্টে দেখতে গিয়ে লেখাটা পড়েই ফেললাম। সত্যি ভালো লেখা। আমার বিচারে অন্তত ভালো। দিন তিনেক পরে দেখলাম, ভবনাথবাবু সেই লেখাটা পড়ছেন। সব লেখা যেমন খুঁটিয়ে পড়েন এটাও তেমনি পড়লেন, তারপর পাশের আর কতকগুলো লেখার সঙ্গে সেটা রেখে দিলেন।

কিন্তু আরো তিন-চারদিন না যেতেই ভদ্রমহিলা আবার এসে হাজির। প্রত্যাশাভরা হাসি হাসি মুখ, সযত্ন বেশবাস, সুচারু প্রসাধন। ভবনাথবাবুর সামনে বসে ঈষৎ আব্দারের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন–আমার লেখাটা পড়লেন?

জবাবে ভবনাথবাবু মুখ তুলে দুই-এক মুহূর্ত দেখলেন, তারপর পাশের রচনাগুলোর মধ্যে থেকে তাঁর লেখাটা বার করে দিয়ে বললেন, নিয়ে যান।

মহিলার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।মনোনীত হল না বুঝি?

অন্য লেখা পড়তে পড়তে ভবনাথবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ, হল না।

শুকনো মুখে মহিলা আবেদন জানালেন-ত্রুটিগুলো যদি একটু বলে দিতেন

ভবনাথবাবু আবার মুখ তুললেন। খানিক নিরীক্ষণ করে জবাব দিলেন–সেটা বলা একটু শক্ত।

যে-রকম নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে বললেন কথা কটা, মহিলা হকচকিয়ে গিয়ে লেখাটি তুলে নিয়ে নীরবে প্রস্থান করে বাঁচলেন।

আমার বিশ্বাস লেখাটা ছাপা হবে বলেই ওখানে ছিল। মহিলা আবার তদবির করতে না এলে ওটা ছাপা হত।

এমন কি, অতটা সচেতন বেশবাস, সুচারু প্রসাধন না করে এলে, বা ও-রকম হাসিমুখে তার আবির্ভাব না ঘটলেও হয়ত ছাপা হত।

সভাপতিত্ব করতে ডেকে এনে এ-হেন লোককে অক্ষরজ্ঞানবর্জিত রমণীর কবিতা শোনানো বা কবিতা ছাপার সুপারিশের নামে গায়ে জ্বর আসবে না তো কি?

গাঁয়ে নতুন পাঠাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য ভবনাথবাবুর আগমন। কোথাও আসেন না বড়। শ্রীবিলাসবাবুর ধড়-পাকড়ে পড়ে আমি বিশেষভাবে আবেদন। জানাতে তবে রাজী হয়েছেন। পাঁচখানা গ্রামের উদ্যোক্তারা অনেক জল্পনা-পরিকল্পনার। পরে এই সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করতে চলেছে। সমস্ত এলাকায় আর দ্বিতীয় লাইব্রেরি নেই। এর জন্যে ঘরে ঘরে চাদা তোলা হয়েছে, একজন জমি দিয়েছেন, আর পাঁচজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক মিলে ঘর তুলে দিয়েছেন। বেশ কিছু টাকার বইও কেনা হয়েছে।

এতবড় ব্যাপারটা অনুষ্ঠানশূন্যভাবে শুরু করতে কারো মন ওঠে না। গ্রামবাসীদের এত উৎসাহের কথা শুনেই ভবনাথবাবু শেষপর্যন্ত আসতে আপত্তি করেন নি।

শ্রীবিলাসবাবু গায়ের ওই উদ্যোক্তাদের একজন। অনেক মাথা ঘামিয়ে আমার সঙ্গে একটা আত্মীয়তার যোগ আবিষ্কার করেছে সে। অবশ্য তার সঙ্গে জানাশুনা অনেক দিনের। কিন্তু সম্প্রতি তার আত্মীয়তা বজায় রাখার নিষ্ঠা দেখলে সম্পর্কটা দূরের কেউ বলবে না। গায়ে লাইব্রেরি করার উৎসাহ এবং উদ্দীপনার পিছনে তার ছোটখাটো রকমের একটু স্বার্থও আছে। ওই গায়ে তার বইয়ের দোকান। এতদিন শুধু ইস্কুল-বই বিক্রির ওপর নির্ভর করতে হত্ন। লাইব্রেরি হলে গল্প-উপন্যাস মাসিকপত্র। সাপ্তাহিকপত্রও তার মারফতই কেনা হবে জানা কথাই।

এখন প্রস্তাব শুনে আমার চক্ষুস্থির।

যথাসময়ে ট্রেন ধামুয়া স্টেশনে পৌঁছুলো। আরো জনাকতক লোক আমাদের নিতে এসেছে। সকলেরই ব্যস্তসমস্ত ভাব, সশ্রদ্ধ চাউনি। এদের সামনে শ্রীবিলাসবাবুকে দেখে মনে হল, সে যেন দিগ্বিজয় করে ফিরেছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুবার সময় ভবনাথবাবুর উদ্দেশে মুখ কাচুমাচু করে বললাম –এখন আবার গরুর গাড়িতে উঠতে হবে শুনছি!

হৃষ্ট মুখে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন, এখানে তুমি ট্রাম-বাস পাবে ভেবে এসেছিলে নাকি! এককালে কত গরুর গাড়িতে চড়েছি।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ছেলেরা আর শ্রীবিলাসবাবু টেনে-টুনে ভবনাথবাবুকে গাড়িতে তুলল। মোটা শরীর ভরনাথবাবুর, এটুকু ধকলেই অল্প অল্প হাঁপ ধরেছে। –কিন্তু তাঁকে এত খুশী আর বোধহয় দেখি নি। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে গরুর গাড়ি চলেছে, দুদিকে ধানী-জমি, মাঠ, গাছ-গাছড়া, ঝোঁপঝাড়। ভবনাথবাবু আমাকে গাছপালা চেনাচ্ছেন, আর শহুরে মানুষ বলে টিকা-টিপ্পনী কাটছেন।

–ওগুলো কিসের ঝোঁপ বলো তো? বনতুলসী–নাম শুনেছ, না তাও শোন নি? আর ওগুলো? শহুরে সাহিত্যিক জানবে কি করে–ওগুলো আটিশ্বরী।–শেষে আকন্দের জঙ্গল চিনতে পারলুম না দেখে প্রায় রেগেই গেলেন তিনি, বললেন তোমাদের শহুরে সাহিত্যিকদের ধরে ধরে কিছুকালের জন্য বনবাসের মতো গ্রামবাসে পাঠানো উচিত।

মোটকথা আমাকে জব্দ করতে করতে বেশ আনন্দের মধ্যেই তিনি গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলেন। আমিও হাসছিলাম বটে কিন্তু বিকেলের কথা ভেবে শঙ্কার ছায়াটাকে মন থেকে সরানো যাচ্ছিল না।

গ্রামবাসীদের সরল অনাড়ম্বর প্রীতি-অভ্যর্থনা মনে লেগে থাকার মতো। দুপুরে খানিক বিশ্রামের পর সভার কাজ শুরু হল। শীতকাল, অসুবিধে কিছু নেই। ভবনাথবাবু বক্তৃতা করলেন। তার সাদা-মাটা আন্তরিক বক্তৃতা শুনে এই সাধারণ লোকেরা ভারি খুশী।

অনুষ্ঠান শেষ হল।

আমাদের ফেরার গাড়ি সেই রাত আটটায়। তার ওপর শোনা গেল, তিন চার ক্রোশ দূরের কোনো এক ভদ্রলোকের দুটো সাইকেল-রিকশ সংগ্রহ করা গেছে-তাই ফেরার

সময় গরুর গাড়ির মতো অত সময়ও লাগবে না। এখান থেকে সাতটায়– বেরুলেও আমরা হেসে-খেলে পৌঁছুবো।

অতএব আপাতত ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের অখণ্ড অবকাশ।

কিন্তু এ অবকাশ আমি চাই নি। ভবনাথবাবুর বক্তৃতার ফাঁকেও আমার দুচোখ নিজের অজ্ঞাতে অক্ষরজ্ঞান-শূন্য সেই কবি-মহিলাকে খুঁজেছে। কিন্তু ভবনাথবাবুর পাশে মঞ্চে বসে ঠিক ঠাওর করতে পারি নি।

সভা শেষে লাইব্রেরি-ঘরে এসে আবার বসলাম আমরা। শীতের বিকেল শেষ হতে না হতে সন্ধ্যে। শুধু শ্রীবিলাসবাবু নয়, অন্যান্য মাতব্বররাও সাগ্রহে কনকদেবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। মহিলার মুখে মুখে কবিতা বানানো তাদের কাছে মস্ত বিস্ময়! প্রশংসার ছলে সেই বিস্ময় জ্ঞাপন করল তারা, কবিতাগুলো একবার দেখার জন্য। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো।

ভবনাথবাবু বললেন–বেশ তো নিয়ে আসুন না, মহিলাটিকেও আসতে বলুন, দুই-একটা কবিতা শোনা যাবে।

তক্ষুনি লোক ছুটল।

আমার অস্বস্তি বাড়ছে। কবিতা প্রসঙ্গে অত স্তুতির বদলে এরা যদি মহিলাটির বেদনাকরুণ জীবনের আখ্যানটুকু শোনাতো, তাতে বরং কাজ হত। স্বভাবকঠোর

সম্পাদকের মনটা হয়ত বা নরম থাকত। কিন্তু এরা জনে জনে শুধু মহিলার আশ্চর্য ক্ষমতার কথাই পঞ্চমুখে বলে গেল।

দশ মিনিটের মধ্যেই কনকদেবী এলেন। না, এঁকে সভায় দেখি নি বটে। সাধারণ আটপৌরে বিধবার বেশবাস। তামাটে গায়ের রঙ, এককালে বেশ ফরসা ছিলেন মনে হয়। বয়স পঞ্চাশের ওধারে, চাপা উদ্দীপনায় মুখখানি ঈষৎ আরক্ত। হাতে একখানি কালো মোটা বাঁধানো খাতা।

ভবনাথবাবুর পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। তারপর খাতাখানা তার পায়ের কাছেই রাখলেন।

আমার মনে হল, আত্মজ সন্তানকে পরম নির্ভয়ে গুরুপায়ে সমর্পণ করে দিলেন।

-বসুন মা, বসুন। ভবনাথবাবু গম্ভীর। সভয়ে তার মুখে সম্পাদকের সেই চিরাচরিত গাম্ভীর্য দেখছি আমি।

তিনি খাতাটা তুলে নিলেন। একটি একটি করে পাতা উল্টে দেখে যেতে লাগলেন। সকলে উন্মুখ। তার একটি কথা, একটি মন্তব্যের ওপর যেন অনেক কিছু নির্ভর করছে।

অনেকক্ষণ ধরে দেখে তিনি একটিও কথা না বলে খাতাটা শুধু আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

সেটা নেবার ফাঁকে মহিলার দিকে চোখ পড়ল। মনে হল, দুই চোখে এমন অধীর প্রতীক্ষা, এমন নীরব প্রত্যাশা, আমি আর দেখি নি।

পাতাগুলো শুধু উল্টেই গেলাম, পড়া হল না। আঁকা-বাঁকা কঁচা ছাঁদের লেখা, খাতা বোঝাই কবিতা। কংসের অত্যাচার, দেবকীর মনোবেদনা, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বেহুলার শোক, গান্ধারীর বিলাপ, সাবিত্রীর সঙ্কল্প, লব-কুশের বীরত্ব–এমনি অজস্র প্রসঙ্গে এক পাতা দু পাতা করে এক-একটা কবিতা।

মুখ তুলতেই ভবনাথবাবু আবার হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিয়ে নিলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন–আশ্চর্য!তারপর একটা পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনি অক্ষর চেনেন না, অথচ কোন পাতায় কোন কবিতা আছে দেখলে বলে যেতে পারেন?

কনকদেবী যেন জীবনের সব থেকে বড় সংশয়টা উত্তীর্ণ হয়েছেন। অদ্ভুত কমনীয় দেখাচ্ছে মুখখানা। প্রত্যয়ভরা দুচোখ মেলে তাকালেন তাঁর দিকে, তারপর মাথা নাড়লেন।...পারেন।

–আচ্ছা, এই কবিতাটা বলুন তো শুনি।

ঈষৎ ঝুঁকে পাতাটা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলেন কনক দেবী। ভবনাথবাবু খাতাটা এগিয়ে দিলেন।

কিন্তু তার আগেই কবিতাটা হয়ত চেনা হয়ে গেছে। আবার যথাপূর্ব স্থির হয়ে মহিলা মাথা নুইয়ে বসে রইলেন একটু। সংকোচ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাও হতে পারে। ঘরসুদ্ধ সকলে উৎকর্ণ। আমিও।

টানা সুরের আবৃত্তি কানে এল। মৃদু কণ্ঠ ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল:

প্রহ্লাদ কহে, আমার অন্তর্যামী যিনি
সর্বত্র বিরাজেন তিনি।
শূন্যে জলে স্থলে সমুদ্রে পর্বতে।
তিনি বিনা কিছু নাই নিখিলে ভবেতে।
তারে যদি চাহ পিতা অশ্রুজলে ভাসি
তোমারে দিবেন দেখা মৃদু মৃদু হাসি।
দর্পভরে চাহ যদি দেখিবারে তারে।
দর্পহারী রূপে তিনি আসিবেন দ্বারে।
ভক্তসখা রূপে যদি নাও তারে বরি
দেখিবে সম্মুখে তোমার দাঁড়ায়ে শ্রীহরি।

ভাষা ভাব ছন্দ মিলের কথা কিছু মনে হল না, অনুচ্চ রমণীকণ্ঠের একটুখানি মূর্ত আবেগ যেন কানে লেগে থাকল। ঘরের জোড়া জোড়া মুগ্ধ চোখ এবারে ভবনাথবাবুর মুখখানাকে হেঁকে ধরল। তাদের উক্তি যে একবর্ণও মিথ্যে নয়, তাই যেন প্রমাণ হয়ে গেল।

ভবনাথবাবুও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠলেন বোধহয়। কবিকে দেখলেন একটু। কনকদেবী অধোবদন।

ভবনাথবাবু বললেন–এই খাতায় নেই এ-রকম একটা কবিতা বলুন শুনি

অর্থাৎ, এইখানে বসে মুখে মুখে কবিতা বানানোর আশ্চর্য ক্ষমতাটুকুও যাচাই না করে নড়বেন না তিনি। কনকদেবী আবার মুখ তুললেন। আশায় আশ্বাসে তামাটে মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। প্রথমবারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার আস্থা বেড়েছে, আর এবারেও যে উত্তীর্ণ হবেন, তাতেও কোনো সংশয় নেই।

চোখ বুজে ভাবলেন খানিক। নিশ্চল মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। ঘরের মধ্যে আবারও একটা স্তব্ধতা ভরাট হয়ে উঠেছে। যারা চেয়ে আছে কবির দিকে, দেখলে মনে হবে পরীক্ষা তাদেরই। বেশ একটু সময় নিয়ে কনকদেবী চোখ মেলে তাকালেন। তিনি প্রস্তুত।

আগের বারের মতোই একটা আবেগ ঘরের মধ্যে পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এবারের এই আবেগ জ্বালাভরা, বেদনাভরা, দরদভরা। একটা তীব্র অনুভূতি যেন কবির মুখে শিখা হয়ে জ্বলছে। তাই

..করজোড়ে নতশিরে অভিবারে সাজা।
মুনির সমুখে আসি দাঁড়াইল রাজা।
পুত্রশোকে মুনি কান্দে, কান্দে মুনিজায়া
কেমনে বাঁচিবে তারা–প্রাণ বিনা কায়া।
সহসা শোকানলে জ্বলি মুনি কহেন রাজারে

শব্দভেদী বান হানি শুধু হিংসা করিবারে
পানরত গজভ্রমে বধিলে সিন্ধুরে
রাঙাইলে সরযূর নীরে।
হারায়ে প্রাণের ধন।
এই প্রাণ মোর দিব বিসর্জন।
তোমা পরে রাজা এই অভিশাপ
তুমিও ত্যাজিবে দেহ লভি পুত্রশোক-তাপ।
অবাক বিষণ্ণ রাজা কাপে থর-থর।
নিঃসন্তানেরে একি অভিশাপ দিলা মুনিবর!
মুনি বরে অভিশাপ সত্য যদি হয়
সন্তান গেহে তবে আসিবে নিশ্চয়।

অনেকক্ষণ বাদে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন ভবনাথবাবু। সমাধি-ভঙ্গ হল যেন। কবিতা প্রসঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করলেন না, ভালো-মন্দ একটি কথাও বললেন না। কিন্তু যে কথা বললেন, শুনে শুধু আমারই বিস্ময়ের শেষ নেই।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ভবনাথবাবু, তারপর বললেন–আপনার এই খাতাটা আমাকে দেবেন? আপনার তো এটা কোনো কাজে লাগবে না, আমি দেখি যদি কিছু করতে পারি।

এক ঝুড়ি প্রশংসার থেকেও এই কটা কথার মূল্য বেশি। ঘরের সবকটি লোকের মনে যেন এক নীরব খুশীর তরঙ্গ বয়ে গেল। তৃপ্তিতে কৃতজ্ঞতায় কনকদেবী একটি কথাও

বলতে পারলেন না। ভবনাথবাবুর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে আস্তে আস্তে উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। কবিতার খাতা ভবনাথবাবুর হাতে।

.

যথাসময়ে আমরা আবার স্টেশনে পৌঁছলাম। শ্রীবিলাসবাব এবং আর একজন আমাদের। ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। শ্রীবিলাসবাবু আনন্দে ডগমগ, ট্রেন ছাড়ার আগে আমার কানে কানে আর একবার বলল, খাতাটার কথা ওঁকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবেন কিন্তু, আমি পরে খবর নেব।

গাড়ি ছাড়তে ভবনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন–শ্রীবিলাস কি বলে গেল?

–ওই খাতাটার কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে বলল।

ইতিমধ্যে কবি বা কবিতা প্রসঙ্গে আর একটি কথাও হয় নি। এখনো কিছু না বলে ভবনাথবাবু বাইরের অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারলুম না, ভেতরটা থেকে থেকে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। উষ্ণ হয়ে উঠছে।

সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম–খাতাটা চেয়ে নিয়ে এলেন কেন, সত্যিই কবিতা ছাপবেন নাকি?

ঈষৎ বিস্ময় মেশানো গাম্ভীর্যে আমার দিকে ফিরলেন তিনি।–এ কবিতা ছাপব কি করে?

-তাহলে নিয়ে এলেন কেন? ভদ্রমহিলা আশা করে থাকবেন, শ্রীবিলাসবাবুও তাগিদ দিতে ছাড়বে না।

নির্লিপ্ত মুখে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন–কিছুদিন বাদে খাতাটা হারিয়ে যেতে দোষ কি?

আমি হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত।

এতকাল ভদ্রলোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। কিন্তু সামান্য চক্ষুলজ্জা বাঁচানোর জন্য তিনি এই কাণ্ড করে এলেন মনে হতে সব যেন এক মুহূর্তে যেতে বসল। নিজের অগোচরে প্রায় রূঢ়কণ্ঠেই বলে উঠলাম, ভদ্রমহিলার সব কথা জানলে এভাবে তাঁকে আপনি

থেমে গেলাম। কেন, বা কি দেখে থামলাম জানি না।

ভবনাথবাবু বললেন, আসার সময় শ্রীবিলাস তোমাকে বলছিল, শুনছিলাম

আবারও বিস্ময়। অর্থাৎ, আসার সময় ট্রেনে তিনি আদৌ ঘুমোন নি। কনকদেবীর বৃত্তান্ত সব শুনেছেন।

আমি বিমূঢ় মুখে অপেক্ষা করছি। ভবনাথবাবু বাইরের অন্ধকার দেখছেন। শেষে আমার নীরব প্রতীক্ষা অনুভব করেই যেন মুখ ফেরালেন। বললেন–শুনেছি বলেই খাতাটা নিলাম। না নিলে আজ হোক, কাল হোক, মেয়েটির এই কবিতার আশ্রয়টুকও যেত। আমার হাত দিয়ে খাতাটা খোয়া গেছে শুনলে ভয়ানক দুঃখ পাবে, পাঁচজনের কাছে

দুঃখের কথা বলবে, মনে মনে হয়ত আমাকে ঠিক বিশ্বাসও করবে না। ...তবু তাতে সান্ত্বনা থাকবে, নিজের কাছে তার কবিতার দাম কমবে না। বরং বাড়বে। আবার নতুন খাতা হবে। আশ্রয়টা হয়ত আরো পাকাঁপোক্ত হবে।

.

ট্রেন ছুটছে।

দূরে দূরে এক-একটা ল্যাম্পপোস্টের আর কুঁড়েঘরের আলো চোখে পড়ছে। অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে ওগুলোও যেন এক অজ্ঞাত অখ্যাত কবি-রমণীর মুখের মতো। আঁধারে মেশে না।

ভবনাথবাবু জানলায় ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে আছেন। সৌম্য, গম্ভীর। থেকে থেকে আমি তাকেও দেখছি। মনে হচ্ছে, এত কাছ থেকে আর বুঝি তাকে কোনোদিন দেখি নি।